ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল



কুরআন ও হাদীস সমর্থিত এক নূরানী মাহফিল

মক্কা-মদিনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহের ছবি সহ



মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী
সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী

ঈদে মিলাদুন্নবী
ও
মিলাদ মাহফিল

কুরআন ও হাদীস সমর্থিত এক নূরানী মাহফিল

সংকলন
মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাফওয়ান নোমানী
খাতীব: মসজিদে মুফতী এ আযম,

এবং

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী
পরিচালক:মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী

পরিবেশনায়

বারকাতী পাবলিকেশন্স

প্রতিষ্ঠাতা : সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.)
১৪/১, তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

www.AmarIslam.com

ইদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল

কুরআন ও হাদীস সমর্থিত এক নূরানী মাহফিল

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম ওয়াহেদী

প্রকাশক

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ঈয়ামান

কম্পোজ

এম. হক কম্পিউটার্স

দ্বিতীয় প্রকাশ

রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী, January 2012, মাঘ ১৪১৮

প্রাপ্তিস্থান

আন্ নূর পাবলিকেশন্স ৫২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	রশীদ বুক হাউস ৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০
গাউছিয়া পাবলিকেশন্স ইসলামী টাওয়ার ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	আফতাব বুক হাউস কম্পিউটার কমপ্লেক্স ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া : ২০০.০০ টাকা (মাত্র)

USD : 4.00 $

Eid e Miladunnabi and Milad Mahfil

Quran o Hadees Somortiho ek nurani mahfil

Written by: Mowlana Sayed Muhammad Safwan Nowmani

Sayed Muhammad Naimul Ehasan Barkati

Published by: Sayed Muhammad Yaman

Barkati Publications

14/1 Tanogang lane, Kolutola, Sutrapur, Dhaka -1100

Phone # 088 0192-1696558, 088 0155-2314557

Email: barkatipublications@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

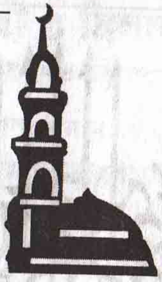
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنْ

وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرُبٍ وَمِنْ عَجَمِ

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ

لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحَمِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ



بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ

كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

বালগাল উলা বিকামালিহি

কাশাফাদ দোজা বিজামালিহি

হাসুনাত জামি উখিসালিহি

সাল্লু আলাইহি ওয়াআলাইহি

তিনি কামালাতের উৎকর্ষে আরোহণ করলেন স্বীয় মহিমায়।
অন্ধকারকে দূর করলেন নিজ সৌন্দর্যে।
তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিল সবচেয়ে সুন্দর।
তাঁর ও তাঁর বংশধরদের উপর জানাই দরূদ ও সালাম

উৎসর্গ

ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত

তিন ভাইয়ের জীবনী

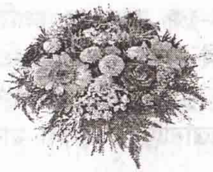


মুফতী-এ-আযম

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী (রহ.)



প্রারম্ভিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খেদমতে জানাই অসংখ্য শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা যে তিনি আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন যে তার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সম্মানে ও মুহাব্বতের নির্দেশনাস্বরূপ **ইদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল কুরআন ও হাদীস সমর্থিত এক নূরানী মাহফিল**" নামক বই প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন এবং দরূদ ও সালাম পেশ করছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ যার সৌজন্যে এই ত্রিভুবন মুখরিত, সুশোভিত। প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ এমন এক মহান নবী যার নামকে আল্লাহ নিজের নামের পাশে স্থান দিয়েছেন। তাই কোন ব্যক্তি যদি শুধু لَآاِلٰهَ اِلَّااللهُ বলে তবে সে মুসলমান হবে না যতক্ষণ না সে বলে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ অর্থ্যাৎ হুযুর হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে মানা ঈমানের পূর্বশর্ত। শুধু তাই নয় আমাদের প্রিয় নবী আরও বলেছেন "তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে নিজের পিতামাতা, সন্তান সন্তানাদি ও সকল মানব জাতি হতে অধিক না ভালবাসে (সহীহ বুখারী)

তাই একথা বলা অত্যাবশ্যক যে প্রিয়নবীকে ভালোবাসা একজন মুসলমান এবং মুমিন বান্দা হবার পূর্বশর্ত। তাই মহানবীর ইন্তেকালের পরও খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন সহ প্রত্যেক মুমিন তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রিয়নবীকে ভালোবেসেছেন। শুধু তাই নয় তারা প্রিয়নবীকে অনুসরণ করেছেন ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও মুহাব্বতের নির্দেশন স্বরূপ বেশী বেশী দরূদ ও সালাম পেশ করেছেন। পরবর্তীতে সেটিকে আরো সুন্দরভাবে ও আদবের মাধ্যমে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে করা হয় যেখানে প্রিয়নবী এর পবিত্র জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় ও তার প্রতি বসে ও দাড়িয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা হয়।

প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালবাসার ব্যপারে মুসলিম বিশ্বের আলেম সমাজে কোন এখতেলাফ বা মতানৈক্য নেই। কিন্তু তার সম্মানার্থে মিলাদ শরীফ করা ও কিয়াম করা নিয়ে আলেম সমাজের মাঝে কিছু মতভেদ রয়েছে। মূলত যারা এই গুলোর বিরোধিতা করে ও উম্মতকে দ্বিধাবিভক্তি করেছে তারা মূলত তিনটি কারণে করে থাকে।

এক ঃ কিছু মানুষ সবকিছু জেনে শুনে ও বুঝার পরও মিলাদ ও কিয়ামের বিরোধিতা করে।

দুই ঃ কিছু ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান ও গরীমায় নিম্নপর্যায়ে থেকে ধর্মাচারের নামে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এর বিরোধিতা করে।

তিন ঃ কিছু লোক একেবারেই কিছু না জেনে মিলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করে।

মাহফিলে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী সম্বন্ধে ও সমর্থনে পবিত্র কুরআন শরীফে অসংখ্যা আয়াত রয়েছে এবং হাদীসে এর দলিল আছে। তাছাড়া মাহফিলে মিলাদ সম্বন্ধে এবং এর সমর্থনে অসংখ্যা বই লেখা হয়েছে যার সিংহ ভাগই আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় রচিত। কিন্তু বাংলা ভাষায় ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল সম্বন্ধে বেশ কিছু বই থাকলেও তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং মুসলমান ভাইদের আছে এরূপ বইয়ের বিপুল চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই মুসলমান ভাইদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে তাদের অনেক অনুরোধের পর আমি ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল সম্বন্ধে এই বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নেই। এই বইয়ে সাধারণ মুসলমান ভাইদের কথা বিবেচনা করে এতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সহজ ও সাবলীল ভাবে মাহফিলে মিলাদের পক্ষে যুক্তি ও দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বই লিখতে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন আমার বড় ভাই শ্রদ্বেয় মাওলানা সালেম ওয়াহেদী সাহেব এবং এ কাজে আমার স্নেহের ভাতিজা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাঈমুল এহসান বরকতী আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। তাছাড়া আমার বড় ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ঈয়ামান এই বইয়ের প্রকাশনা, মুদ্রন তথা নানা আনুসাঙ্গিক বিষয় সর্ম্পকে পরামর্শ দিয়ে আমার সহযোগিতা ও উৎসাহিত করেছে। **"ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল কুরআন ও হাদীস সমর্থিত এক নূরানী মাহফিল"** বইয়ে মিলাদ মাহফিল ও ঈদে মিলাদুন্নবী সম্বন্ধে খুবই সামান্য ও সাধারণ আলোচনা করা হয়েছে সাধারণ মুসলমান ভাইদের বোঝার সুবিধার্থে। তবে এ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা, বিষয় ও দলীল আছে যা এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে সেই সব তথ্য ও বিষয় নিয়ে ইনশাআল্লাহ আরেকটি বইয়ের কাজ চলছে যা অতি শীঘ্র মুসলমান ভাইদের হাতে পৌছানো সম্ভব হবে।

মানুষ ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। তাই যদি এই বইয়ের তথ্য, বিষয়, দলিল ও মুদ্রণ সংক্রান্ত যে কোন ভুল যদি পাঠকের চোখে ধরা পরে তবে তা লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিতে আনার অনুরোধ থাকল।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি এই যাকে তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে কুরআনে ভূষিত করেছেন, সেই দয়ার সাগর হুযুর হযরত মুহাম্মদ-এর খাস ওয়াসীলায় আমার মরহুম আব্বা এবং আম্মা জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুক এবং এই গ্রন্থের লেখক, পাঠক, শ্রোতা ও আমলকারী তার খাস রহমত বখশিশ করুন। (আমীন)

মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফওয়ান নোমানী
খাতীব, মসজিদে মুফতি-এ-আযম
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা,
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৮১৬৭০৪৬

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ :

"অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে বইমেলা রয়েছে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে। অথচ এখানে যত কিতাব বিক্রি হচ্ছে অধিকাংশই মিলাদ-মাহফিল বিরোধী। মিলাদ-মাহফিলের যুক্তিপূর্ণ দলিলের একটি কিতাবও খুঁজে পেলাম না।"

কথাগুলো ছিল আমার আব্বার যখন ২০০৮ সালের ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম সংলগ্ন ইসলামী বই মেলায় বেড়াতে যাই। এই ঘটনা আমাকেও ব্যথিত করে যে নাম আয়োজন বা ব্যানার সাজিয়ে এত কিছু হচ্ছে অথচ আজ সেখানেই অনেকে ঈদে মিলাদুন্নবীকে অস্বীকার করা হচ্ছে । তখন থেকেই আমার আব্বা ঈদে মিলাদুন্নবীর কুরআন ও হাদীস এর দলীলভিত্তিক একটি কিতাব প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। যেই ভাবা সেই কাজ। সাথে সাথে বই রচনার কাজ শুরু হয়। আমি প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য, দলীল ও রেফারেন্স দিয়ে আমার চাচাকে এই কাজে সহায়তা করি। পরিশেষে সবার সম্মিলিত মেহনতের স্বরূপ এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ২০০৯ সনের মার্চ মাসে আমরা এই কিতাবের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করতে সক্ষম হই। আলহামুদিল্লাহ।

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার জন্ম এমন এক সাইয়্যেদ বংশে হয়েছে যার প্রতিটি সদস্যই মিলাদ মাহফিল করাকে এবং প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। এবং আমাদের মসজিদে মুফতী এ আযম ও প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মিলাদ মাহফিল হয়ে থাকে। এ জন্য একাধিক অনুরোধের কারণে আমার চাচা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফওয়ান সাহেব উদ্যেগী হন এ সম্বন্ধে একটি বই রচনা করতে যা কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিলের যথার্থতা প্রমাণ করবে। তার এই রচনায় আমি নিজ ক্ষুদ্র মেধা ও শ্রম দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

এছাড়াও আলোচনা করা হয়েছে আমার দাদা সাইয়্যেদ নোমান বারকাতী (রহ.), যিনি আজীবন মিলাদ কিয়াম করেছেন মসজিদে মুফতী এ আযমে অনুষ্ঠিত প্রত্যেক মাহফিলে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করতেন। আমাকে মিলাদ-কিয়াম, নাতে রাসূল পড়তে উৎসাহী করেছেন এবং প্রতি সোমবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিলাদ মাহফিল করতেন। পরিশেষে আমার নানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী (রহ.) যিনি নিজের অগ্রজদের ন্যায় ছিলেন একজন খাঁটি মুমিন ও আশেকে রাসূল। তিনি নিজেও মিলাদ কিয়াম করতেন, তাঁর খানকায়ে বারকাতীতে মিলাদ পড়তেন যেটা তার ওফাতের পরও জারি আছে। এটা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে এই তিনজন আলোকিত ব্যক্তির সাথেই আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।

বইটির প্রথম সংস্করণের অল্পদিনের মাথায় সকল কপি শেষ হয়ে যায়। দেরীতে হলেও তিন বছর পর এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হল। এই তিন বছরে আমি হারিয়েছি আমার শ্রদ্ধেয় মামা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আফফান বারকাতী যিনি বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও ২০১০ সালের ২৫ ডিসেম্বর (১৮ মহররম, ১৪৩২ হিজরী) আমার নানী সাইয়্যেদা তাইয়্যেবা খাতুন ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আল্লাহ পাক এদের সবাইকে কবুল করুক ও জান্নাত নসীব করুক। আমীন।

মহান আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে তিনি আমাকে এই কিতাব রচনার উপযোগী করেছেন, অগণিত দরূদ ও সালাম আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি যিনি আমাদের আবে কাউসার পান করাবেন। আমার আব্বা-আম্মার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তাঁরা এই কাজে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে সবাইকে তাঁর প্রিয় বান্দা এবং একজন খাঁটি মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করুন।

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাইমুল ইহসান বারকাতী
পরিচালক
মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা,
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯২১৬৯৬৫৫৮
Email : naimulehasan@gmail.com

কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক কিছুই সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি দলীলকে আরো সুস্পষ্টরূপে সাজানো হয়েছে। বিশেষ করে মিলাদুন্নবীর বিপক্ষে উত্থাপিত আপত্তি এর জবাব গুলো আরো বিশদভাবে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও আমার রচিত দুটি নিবন্ধ **'মহান আল্লাহ পাক ও প্রিয়নবীর নামের কিছু তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য"** এবং **"প্রিয়নবীকে ভালোবাসা ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণ"** এখানে সংযুক্ত করা হল। এতে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে।

ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও মিলাদ মাহফিলের বইয়ের আলোচনা শুরু হলেই আমাদের মনে সর্বপ্রথম যে কিতাবের নাম স্মরণে আসে সেটা হচ্ছে আমার বড় দাদা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) রচিত– سراجا منیر সিরাজুম মুনীরা । উর্দু ভাষায় রচিত ছোট এই বইয়ের চাহিদা ও আকর্ষণ পাঠকসমাজে এত বেশী যে এখনও অনেকেই আমার, আমার চাচার কাছে এসে এই বইটি সংগ্রহ করতে চান। আমার দাদা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) একে উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেন। তবে পাঠক সমাজে বিপুল চাহিদার কথা চিন্তা করে এর বাংলা রচনা সংস্করণেও কাজ শুরু করা হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই তা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। সিরাজুম মুনীরা কিতাব রচনা করার সময় আমার বড় দাদা তাঁর কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এই পঙক্তিদ্বয়ের অবতরণ ঘটিয়েছেন (رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ مَرْ حَبَا مَرْ حَبَا رَسُوْلَ الله) এই জন্য আমি এই কিতাবেরও অনেক স্থানে সেইরূপ পঙক্তি ব্যবহার করেছি। এছাড়াও বইতে বিভিন্ন বাংলা, আরবী ও উর্দু নাতে রাসূল এর সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও বইয়ের শেষে মক্কা ও মদীনার কিছু ঐতিহাসিক ও দুর্লভ ছবি দেয়া হয়েছে।

কিতাবের শেষের দিকে সংক্ষেপে তিন মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। এই তিন ভাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে আলোকিত প্রাণপুরুষ ছিলেন। আমার বড় দাদা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) যাঁকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন কেউ প্রকাশ্যে মিলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করার সুযোগ পায় নি।

সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বইলেখা ও প্রকাশ করার জন্য আমি জনাব মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফওয়ান এবং নাঈমুল ইহসান এর শোকর গুজার এবং তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কুরআন শরীফ এবং হাদীস এর দলিলের মাধ্যমে এই মোবারক দিন পালন করাকে তিনি প্রমাণিত করেছেন। মাহফিলে মিলাদের মাধ্যমে যেভাবে এদেশের সাধারণ মুসলিম সমাজ উপকৃত হয় সে সম্বন্ধে তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা রেখেছেন। কুরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে ذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ "জাককিরহুম বি আইয়্যামিল্লাহ" যার অর্থ ঃ "তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করাও" (১৪, ৫)। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনসমূহের মধ্যে রয়েছে হুযুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আগমনের মাস ও জন্মের দিন। এই দিন পালন করার উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাধারণ মানুষের সম্মুখে পেশ করাও তাদের এ সম্বন্ধে জ্ঞাত করা।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এই খিদমত কবুল করুন। এবং এরই সঙ্গে আমার স্নেহভাজন সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী এই বই লেখার এবং আমার ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ঈয়ামান ও প্রকাশ করার জন্য যে শ্রম দিয়েছেন এবং অবদান রেখেছেন তাদের জন্য আমার দোয়া ও ধন্যবাদ। আল্লাহ তাআলা তাদের এই খিদমত কবুল করুন এবং দ্বীন ও দুনিয়ার নেয়ামত থেকে মালামাল করুন। (আমীন)

মাওলানা মুহাম্মদ সালেম ওয়াহেদী

খলিফা ও ভাগ্নে, মুফতী আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)

সভাপতি

মুফতী-এ-আযম জামে মসজিদ

শুকরিয়া ও মোবারকবাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

জনাব মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ সাফওয়ান নোমানী এবং নাঈমুল ইহসান বারকাতীর কর্তৃক রচিত **"ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল, কুরআন ও হাদীস সমর্থিত এক নুরানী মাহফিল"** বইটি অত্যন্ত সহজ সরল ও সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বইটি পড়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এজন্য মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী, মিলাদ মাহফিল, দরূদ ও সালাম, কিয়াম ও দোয়ার ব্যাখ্যা খুবই সুন্দর ও সহজ ভাবে করা হয়েছে যাতে সাধারণ পাঠক সমাজ সহজে বুঝতে পারবে। এতে পাঠক সমাজ খুবই উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু বর্তমানে আলেম সমাজের মাঝে মিলাদ পড়া ও কিয়াম করা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় রয়েছে। প্রিয়নবী-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা, মাহফিলে মিলাদ পড়া ও কিয়াম এর সমর্থনে করআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে এবং হাদীসে এর দলিল আছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বইটি আন্তরিকতার সাথে আলেম সমাজ পাঠ করলে মিলাদ পড়া ও কিয়াম করা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রকাশক, আমার মামাত ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নাঈমুল ইহসান বারকাতীর নেক নিয়ত কবুল করুন। পরিশেষে আমি বইটির বহুল প্রচার, প্রসার এবং সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করছি। (আমীন)

সৈয়দ মুরাদুল্লাহ আহমাদ সালামী বরকাতী
পীর সাহেব
নারিন্দা খানকাহ শরীফ

প্রকাশকীয়

بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহর খেদমতে জানাচ্ছি অসংখ্য শুকরিয়া যে তিনি আমাকে তাঁর প্রিয়নবী হুযুর হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় দুটি কথা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের প্রিয়নবীর প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর কুরআন শরীফে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে করেছেন। যার প্রশংসা স্বয়ং মহান আল্লাহ করেছেন তাঁর উপযুক্ত প্রশংসা করা সকল মানব জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ প্রিয়নবীর প্রশংসা শুরু করা যায়, শেষ করা যায় না। আমাদের বারকাতী পাবলিকেশন্স এর মূল উদ্দেশ্য এবং এই বইয়েরও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয়নবীর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যাতে তাঁর পবিত্র নামের বরকতে আমাদের কলুষিত দেহ ও আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়।

ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে এমন এক মাহফিল যেখানে আমরা কিছু সংখ্যক মুসলমান একত্রিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ পাই। দুঃখের বিষয় বর্তমানে অনেকেই মিলাদ-কিয়ামের বিরোধিতা করে। অনেকে কিছু না বুঝেই অন্যের কথায় সায় দিয়ে মিলাদ-মাহফিলে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকছেন। ফলে কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করছি আশঙ্কাজনকভাবে মিলাদুন্নবী মাহফিলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তাই উদ্যোগী হলাম এই বিষয়ে কিতাব প্রকাশ করার। আমি শোকর গোজার আমার ছোট ভাই সাফওয়ান নোমানী ও ছেলে নাইমুল ইহসান যারা এই কাজকে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়েছে।

বইটির সম্পাদনায় অসামন্য ভূমিকা রেখেছেন, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ সালেম ওয়াহেদী সাহেব যিনি বিভিন্ন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে আলোচ্য বইটিকে আরো নির্ভরযোগ্য করে তুলেন। তাছাড়া নারিন্দার পীর সাহেব সৈয়দ শাহ মুরাদুল্লাহ এর কৃতজ্ঞতা জানাই যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও বইটি দেখেছেন এবং এ সম্পর্কে নিজের মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন। আরবী পাণ্ডুলিপি ও প্রুফ কারেকশনের দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা কারামাত আলী সাহেব।

এই বইটি প্রকশনার পাশাপাশি পরিবেশনাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ একই বইয়ে একই সাথে বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সী প্রভৃতি ভাষার ব্যবহার হয়েছে। বইটি পরিবেশনা ও বিশেষভাবে বিভিন্ন হামদ নাতসমূহকে দৃষ্টিনন্দন ও যথোপযোগী ফন্ট দিয়ে সাজানো হয়েছে। পরিবেশনার কাজেও আমার ছেলে নাইমুল ইহসান অনেক শ্রম ব্যয় করেছে। মহান আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুক।

বইটির রচনা থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই সর্বোচ্চ সতর্কতা নেয়া হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ ও নির্ভুল হিসেবে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করতে। তারপরও যদি এই বইয়ের তথ্য, বিষয়, দলিল ও মুদ্রণ সংক্রান্ত যে কোন ভুল যদি পাঠকের চোখে ধরা পরে তবে তা লেখকের অথবা প্রকাশকের দৃষ্টিতে আনার অনুরোধ থাকল।

বই প্রকাশনা করায় যেমন শ্রমের প্রয়োজন তেমনি অর্থেরও প্রয়োজন। বর্তমান উর্ধ্বগতির বাজারে বই প্রকাশ করা বিশেষ করে ধর্মীয় বইসমূহ প্রকাশ করা অনেক কঠিন। এরপরও আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে তিনি আমাকে তৌফিক দান করেছেন আমার আব্বার প্রকাশনার সিলসিলাকে জারি রাখার। আমি অনুরোধ করব মুসলমান ভাইদের প্রতি, যাতে আরো অধিক হারে ধর্মীয় কিতাব পড়ুন, কিনুন ও অন্যদের উপহার দিন যাতে আমরা নতুন নতুন বই প্রকাশে উৎসাহ লাভ করতে পারি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে বিনয়ে অবনত হয়ে প্রার্থনা করছি যে তিনি এই বইটির রচনায় যারা শ্রম দিয়েছেন এবং বারকাতী পাবলিকেশন্স এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকেই নিজ খাস রহমতে ধন্য করুক এবং যাদের নামে এই বইটি লেখা হয়েছে সেই মহান ব্যক্তিদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। মহান আল্লাহ আমাকে এবং বারকাতী পাবলিকেশন্সকে তাঁর বিশেষ তৌফিক দান করুন যাতে আমরা নিজেকে ইসলামের খেদমতে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে পারি। (আমীন)

امين ! ياراب العلمين

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ঈয়ামান

১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, সূত্রাপুর,ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৫৫২৩১৪৫৫৭, ০১৬৭৬৭৬০৭১৫

Email: barkatipublications@gmail.com

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈদে মিলাদুন্নবী কুরআন ও হাদীসের আলোকে

তৃতীয় অধ্যায়
মিলাদ মাহফিল কুরআন ও হাদীসের আলোকে

বিষয়	পৃষ্ঠা



মহান আল্লাহ পাক ও প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর নামের কিছু তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য



আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়। নিজের এই একত্ববাদের কথা তিনি যার মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন তিনি হচ্ছেন প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও প্রিয়নবী হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এর নামের মধ্যে কিছু তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেটা এখন আলোচনা করা হবে।

মহান الله এর নাম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইসমে জাত الله ও প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর নামের মধ্যে কিছু চমৎকার বৈশিষ্ট্য লুকায়িত রয়েছে যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে **'শেষ হয়েও হলো না শেষ'**। যেমন মহান আল্লাহর নাম الله গঠিত হয় আরবী ৪টি বর্ণ দিয়ে ا–ل–ل–ه দ্বারা ও প্রিয়নবীর নাম محمد হয় م – ح – م – د এই চারটি অক্ষর দিয়ে। উভয় নামের মধ্যে যে একটি খাস বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে একটি একটি করে বর্ণ কমালেও কোন অর্থ বাকী থেকে যায়, অর্থহীন হয় না।

মহান রাব্বুল আলামীনের নাম পবিত্র কুরআনে ২৭৫১ বার এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ○ (سورة النور ٣٥)

অর্থ: আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি (সূরা নূর : ৩৫)

এখন যদি الله এর নাম থেকে ا বাদ দেয়া হয় তবে হবে لله যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর জন্য। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ○ (سورة البقرة ٢٨٤)

অর্থ: সব আল্লাহ্ তাআলারই যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। (সূরা বাকারা : ২৮৪)

আবার যদি আমরা প্রথম দু'টি বর্ণ ا এবং ل বাদ দেই তাহলে থাকে لَهُ যার অর্থ তাঁর জন্য বা তাঁরই। যেমন পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টি মহান আল্লাহর নামে সাথে এভাবে এসেছে–

إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ (سورة آل عمران ٤٧)

অর্থঃ এভাবেই আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন, 'হয়ে যাও' অতঃ তা হয়ে যায়। (সূরা আলে-ইমরান : ৪৭)

আবার তিনটি বর্ণ বাদ দিলে কেবল অবশিষ্ট থাকে هُ এবং এটির অর্থ দাঁড়ায় তিনি। এটি সর্বনাম হিসেবে পবিত্র কুরআনের একটি স্থানে মহান আল্লাহর নাম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে–

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ط (سورة البقرة ٢٥٥)

অর্থঃ তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। (সূরা বাকারা : ২৫৫)

প্রিয়নবী হযরত محمد ﷺ এর নাম

একইভাবে প্রতিটি একক শব্দের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর নামের মধ্যে।

আমাদের প্রিয়নবীর নাম মুহাম্মদ ﷺ পবিত্র কুরআনে ৪ বার এসেছে এবং এক স্থানে তাঁকে আহমদ (احمد) হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, প্রিয়নবীর নাম দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আহমদ ছিল ও দুনিয়াতে আগমনের পর সেটা হল মুহাম্মদ ﷺ। প্রিয়নবীর নাম পবিত্র কুরআনে যে সকল স্থানে এসেছে সেগুলো হলো–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ○ (سورة آل عمران ١٤٤)

অর্থঃ আর মুহাম্মদ ও একজন রসূল । তার পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন । (সূরা আলে-ইমরানঃ ১৪৪)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ (سورة الأحزاب ٤٠)

অর্থঃ মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা আল আহযাবঃ ৪০)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاٰمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ○ (سورة محمد ٢)

অর্থ: আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (সূরা মুহাম্মদ : ২)

مُّحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا ○ (سورة الفتح ٢٩)

অর্থ: মুহম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। –(সূরা আল্ ফাত্হ্ : ২৯)

এছাড়াও একটি স্থানে আহমদ احمد হিসেবে এসেছে।

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي إِسْرَائِيْلَ إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ○ (سورة الصف ٦)

অর্থ: স্মরণ কর, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা বলল : হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি

সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম আহমদ; অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল : এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। -(সূরা আছ ছাফ : ৬)

আমাদের প্রিয়নবীর মূল নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ যেটা ৪টি আরবী শব্দ দিয়ে গঠিত।

আভিধানিকভাবে এই নামের অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রশংসা। অর্থাৎ প্রশংসা বিশেষণের বিশেষায়িত রূপ। বাংলায় একে বলে বিশেষণের অতিশায়ন (Superlative Degree) | এই সৃষ্টিকুলের মধ্যে মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ পাকের পর যিনি সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবীদার তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

চারটি বর্ণের মধ্যে প্রথমটি বাদ দিলে অর্থাৎ م বাদ দিলে হয় حمد যার মানে প্রশংসা। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ এমন এক সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ অসংখ্য স্থানে তাঁর প্রশংসা করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○ (سورة الشرح ٤)

অর্থ ঃ আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতিকে সুউচ্চ করেছি।

(সুরা আল-ইনশিরাহ-৪)

এই জন্য বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় আমাদের প্রিয়নবীর যে পরিমাণ প্রশংসামূলক কবিতা তথা নাতে রাসূল রচনা করা হয় সেরূপ অন্য কোন মানুষের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

প্রিয়নবীর নামের আরেকটি বর্ণ ح সরালে হয় مد। এটি আরবী ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শব্দকে দীর্ঘ টান দেয়ার জন্য। মাদের ক্ষেত্রবিশেষে এক আলিফ থেকে চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেভাবে কোন শব্দকে তার স্বাভাবিক উচ্চারণের চেয়ে অধিক টেনে পড়তে হয় তেমনি আমাদের প্রিয় হাবীবের মর্যাদা ও শান শওকত অন্যান্য যে কোনো বক্তির চেয়ে বেশী ও সুউচ্চ।

এইভাবে করতে করতে প্রিয়নবীর নামের তিনটি বর্ণ সরিয়ে দিলে অবশিষ্ট থাকে د অনেকেই একে গ্রহণ করেন دالیل হিসেবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে এক অদ্বিতীয় ও সর্বপ্রকার অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত এক সুমহান সত্তা সেটা জানার জন্য আমাদের দলিল হচ্ছেন স্বয়ং প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ।

মহান আল্লাহ্ যে এক ও অদ্বিতীয় সেটা বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবকে নির্দেশ দেন। এইজন্য পবিত্র কুরআনে এসেছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ○ اللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ○ (سورة الإخلاص)

অর্থ ঃ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

–(সূরা এখলাস)

আবার অনেকে د শব্দকে গ্রহণ করেছেন درود হিসেবে। অর্থাৎ প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম। প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় কাজ যেটা করার হুকুম আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক মানবজাতিকে অনেক আমল ও ইবাদতসমূহ করতে বলেছেন। কিন্তু কোনটিই তিনি নিজে করেন নি। যেমন মহান আল্লাহ নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন, যাকাত প্রদানের আদেশ দিয়েছেন, সাওম পালন করার, হজ্ব করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু কোন কাজ তিনি নিজে করে দেখান নি। কিন্তু প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺএর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা এমন একটি কাজ যেটা আল্লাহ পাক নিজে করেছেন, এরপর ফেরেশতাদেরকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন ও সর্বশেষে সমস্ত ঈমানদারদেরকে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ○ (سورة الأحزاب ٥٦)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ নবীর প্রতি দরূদও সালাম (রহমত) বর্ষণ করছেন। অতএব হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো। (সূরা আল-আহযাব-৫৬)

প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম নিজে প্রেরণ এবং মুমিন বান্দাদেরকে সেরূপ করার নির্দেশ দানের মধ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি নিজ অপরিসীম মুহাব্বতের ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের মধ্যেকার মুহাব্বতের সম্পর্ক ওয়াজ করে বা বই লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। এটা নিজেই বুঝে নিতে হবে। কারণ–

محبت معنٰے الفاز میں لائی نہیں جاتی

یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی

মুহাব্বত এমন জিনিস যা শব্দে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়
এটা এমন এক অবস্থা যা বুঝানো সম্ভব নয়

অনেক আরবী ভাষাবিদ ও সংখ্যাবিদ আরবী শব্দে নোক্তাযুক্ত বর্ণকে বেশী পছন্দ করেন না। কারণ • নোক্তার একটি আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খুত বা বিচ্যুতি। কিন্তু পরম বিশ্বয়ের ব্যাপার আল্লাহর নাম ও প্রিয়হাবীবের নামের কোন নোক্তাযুক্ত বর্ণ নেই। এমন কি আমাদের কালেমা তাইয়্যেবা ইসলামে প্রবেশের চাবি সেটাও নোক্তামুক্ত শব্দ দিয়ে গঠিত।

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-

কোন মাবুদ নেই এক আল-হ ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন তাঁর রাসূল।

মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সৃষ্টির রহস্য বুঝার সাধ্য কারো নেই। প্রিয় হাবীবের পবিত্র সীরাতের মধ্যে যে সৌন্দর্য লুকায়িত রয়েছে তা যেমন মানবজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করা সম্ভব নয় ঠিক তেমনিভাবে তাঁর নামের মধ্যে যে তাৎপর্য লুকিয়ে আছে সেটাও আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ সঠিকভাবে জানেন না। এই রকমই হচ্ছে আমাদের প্রিয় হাবীবের প্রশংসা যেটা বর্ণনা করা ছাড়া দুনিয়ার মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য শেখ সাদী (রহ.) যথার্থই বলেছেন–

یا صاحب الجمال ویا سید البشر — من وجهك المنير لقد نور القمر

لا يمكن الثناء كما كان حقه — بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

হে সুদর্শন মহাপুরুষ, হে মানবজাতির সর্দার,
আপনার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও আলোকিত
প্রিয়নবীর প্রশংসা তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী বয়ান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
কিন্তু একথা অতীব বাস্তব যে, আল্লাহ পাকের পর আপনিই শ্রেষ্ঠ

سید محمد نعیم الاحسان برکاتی

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী
২৮.১২.১১

প্রথম অধ্যায়

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, আহমাদে মুজতবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সকল দিক থেকে তাকে করেছেন শ্রেষ্ঠ। তার নান্দনিক চরিত্রমাধুরি দেখে কত মানুষই না ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে তা গননা করে শেষ করা যাবে না। সুন্দর চরিত্রের এমন কোন দিক নেই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বে পূর্ণতা পায়নি। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে ঘিরে সুশোভিত হয়েছে সকল প্রকার নান্দনিক গুনাবলি। দান, বদান্যতা, ভদ্রতা, ক্ষমা, মহানুভবতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, নম্রতা, সবর, বন্ধুত্বসুলভ আচরন, বিনয়, ন্যায়পরায়নতা, দয়া-করুনা, অনুগ্রহ, সাহসিকতা, বীরত্বসহ সকল দিক থেকে তিনি ছিলেন পরিপূর্নতার অনন্য দৃষ্টান্ত। কিতাবের সূচনা করা হল তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ত বর্ননা এবং তাঁর কতিপয় অমূল্য বানী দিয়ে ।

কুরআনের বাণী

اَلنَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।

হাদীসের আলো

وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِى فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ

যে আমার সুন্নতের অনুসরণ করবে (যে ভালবাসবে) সে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে।

শানে মুস্তাফা ﷺ

عظیم سے عظیم تر ہے شان محمد ﷺ

خدا خُدم رتبہ دان محمد ﷺ

উচ্চ থেকে সুউচ্চ হচ্ছে মুহম্মদ ﷺ-এর মাহাত্ম্য

আল্লাহ নিজেই মহান করেছেন তাঁর মর্যাদা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - اَمَّا بَعْدُ : فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ তায়ালা র প্রাপ্য। তাই আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং আমরা তাঁরই কাছে সহায়তা ও সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা তাঁরই কাছে আমাদের নফসের (আত্মার) অমঙ্গলময় ও পাপপূর্ণ প্ররোচনা থেকে এবং তার পরিণতিতে আমাদের নিজেদের পাপকর্ম থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা'আলা যাকে পথ দেখান কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না– আর যাকে বিপথগামী হতে দেন, তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত (শেষ) রাসূল। অতঃপর অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাব-কুরআন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দিক নির্দেশনা ও হিদায়েত হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিদায়েত।

মানব জাতির ইতিহাসের এক ক্রান্তি-লগ্নে, বিশ্ব মানবের রক্ষাকল্পে, বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করার নিমিত্তে এবং বিশ্ব শান্তি কায়েমের জন্যই আবির্ভাব হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি, যিনি মহত্তম আদর্শের অধিকারী, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, বিশ্ব সভ্যতায় যাঁর অবদান সর্বাধিক, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত কোন গত্যান্তর নেই, তাঁর মহান আদর্শের অনুসরণেই রয়েছে পরম শান্তি , পরিপূর্ণ সাফল্য। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা, দয়ামায়া, বিনয় ও নম্রতা, ভদ্রতা, দানশীলতা, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, অঙ্গীকার রক্ষা আমানতদারী, ক্ষমা ও ঔদার্য্য সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তা, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণের প্রচেষ্টা এর প্রত্যেকটিই বিশ্ব শান্তি স্থাপনের মূল উপাদান।

যিনি সর্বপ্রথম বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন, যিনি বিশ্ব-মানবের সার্বিক কল্যাণের নির্ভুলানীল নক্শা পেশ করেছেন তিনিই আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে আকরাম ﷺ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়নবী রসূলে আকরাম ﷺ-কে মাকামে শাফায়াত এবং সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাকে অনুসরণ করলেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভালবাসার প্রমাণ দেয়া হয়। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের তাগিদ করে আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (سورة آل عمران ٣١)

অর্থ : বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন অতীব ক্ষমাকারী পরম দয়ালু। -(সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর প্রতি ভালবাসার প্রমাণ হচ্ছে তাঁর রাসূলকে ভালবাসা। এইজন্য প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে প্রিয়নবী হযরত রসূলে আকরাম ﷺ প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভূত হয় যার জন্য সে প্রিয়নবীর সাথে নিজ সম্পর্ক আরো গভীর করার চেষ্টা করে।

আজকের বিশ্বে সুখ-সামগ্রী রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু কোন শান্তি নেই। এই শান্তি ও কল্যাণের, সত্য ও ন্যায়ের, সুবিচার ও পরোপকারের, দয়ামায়া এবং মমত্ববোধের পরস্পরের সহযোগিতা ও সহানুভূতির, সততা এবং ন্যায় পরায়ণতার পয়গামই বহন করে এনেছেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে আকরাম ﷺ।

তাই আজকের অশান্ত বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নিতান্ত প্রয়োজনেই বিশ্ব শান্তির প্রবর্তক বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম ﷺ এর মহান আদর্শের অনুসরণ করা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। যাঁর মহান দরবারে সাদা-কালোর কোনও ভেদাভেদ নেই। কৃষ্ণাঙ্গ হযরত বেলাল (রাঃ) এবং উচ্চ বংশীয় হযরত ওমর (রাঃ) এর মর্যাদায় যে দরবারে কোন পার্থক্য নেই। সাম্য-মৈত্রী মমত্ববোধ এবং বিশ্ববোধ যে দরবারের বৈশিষ্ট্য, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ এবং ভাষা নির্বিশেষে সকলে সম মর্যাদা লাভ করে। বিশ্ব শান্তির জন্যই তাঁর অনুসরণ বাস্তববাদী পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

আসলে প্রিয়নবী হযরত রসূলে আকরাম ﷺ এর পবিত্র সীরাত হচ্ছে এক জীবন্ত আদর্শ, যে আদর্শ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা আল্লাহর রাসূলের আবির্ভাবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। তাঁর **"উসওয়াতুল হাসানাহ"** সারা জাহানের মুসলমানদের জন্য এক বাস্তব নমুনা। তাঁর চরিত্রের আলোকেই একজন মুসলমানের জীবন পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রিয়নবী ﷺ এর মহান আদর্শের অনুসরণের তাগিদ করে আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ○ (سورة الأحزاب ٢١)

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম নমুনা- সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর দরবারে হাজিরীর আকাংখা রাখে এবং কেয়ামতের দিন সাফল্যের আশা রাখে।। (সূরা আল আহযাব-২১)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রিয়নবী হযরত রসূলে আকরাম ﷺ এর পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "পবিত্র কুরআনই হচেছ তাঁর চরিত্র"।

মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে, মানব-মর্যাদার উন্নয়নে তথা-বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে মহানবী ﷺ-এর দান অতুলনীয় অপরিমেয়। কেননা মানবতা যখন অবহেলিত, উপেক্ষিত-জুলুম, অত্যাচার অন্যায় অবিচারের ঘনান্ধকারে যখন বিশ্ব আচ্ছন্ন, পৌত্তলিকতা ও ভোগবাদের মরফিয়া পান করে যখন সকলেই বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যচ্যুত এবং সম্পূর্ণ আত্মবিস্তৃত, বিশ্ব-প্রতিপালকের আবাধ্য হয়ে তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করে মানুষ যখন পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত, মানবতার ঠিক এমনি দুর্দিনে আবির্ভাব হয়েছিল শান্তির অগ্রদূত, মহানবী হযরত রসূলে আকরাম ﷺ এর। তিনি মরণোন্মুখ মানবতাকে নব জীবন দান করলেন। তিনি পরিবেশন করলেন বেহেশতীনূর মানুষের শিরায় উপশিরায়। এমনিভাবে মহানবী ﷺ মানুষকে তার উচ্চ মর্যাদায় আসীন করলেন তিনি বললেন, ওহে আত্মবিস্তৃত মানুষ তুমি ছোট নও, তুমি তুচ্ছ নও, তুমি দুনিয়ার বুকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খলিফা বা প্রতিনিধি। অতএব তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ তাই সকল সৃষ্টি তোমার অনুগত, করতলগত এবং সর্বক্ষণ তোমার সেবায় নিয়োজিত। কেননা যমিন- আসমান আকাশবাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা, বৃক্ষ, তরুলতা এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাক মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করে, সবার উপরে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কাজে মহান আল্লাহ পাকের পথের পথিক, পরকালীন জীবন সুখময় হওয়ার আশা রাখে তাঁর কাছে প্রিয়নবী হযরত রসূলে আকরাম ﷺ এর অনুসরণের অন্য কোন বিকল্প নেই। আমাদের এই পথ প্রদর্শক তাঁর নিজ জীবনে আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শ রেখে গিয়েছেন। তাঁর আদর্শ মানুষের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পারসম্পরিক সম্পর্ক তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম আদর্শ। তাই যারা তাঁকে মুহব্বাত করবে এবং তাঁকে অনুসরণ করবে তারাই আখেরাতের জীবনে সফলকাম হবে।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর পবিত্র জীবন এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

৫৭০ খ্রিস্টাব্দ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্ম। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবার।

৫৭২ খ্রিস্টাব্দ : দুবছর পর তিনি দুগ্ধ পান বন্ধ করেন। ধাত্রী মা হালিমার ঘরে অবস্থান।

৫৭৩-৭৫ খ্রিস্টাব্দ : ৩-৫ বছর বয়সে তার দুই বার বক্ষ বিদারণ হয়।

৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ : ৫/৬ বছর বয়সকালে জননী আমিনার কোলে প্রত্যাবর্তন।

৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ : ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে নানার বাড়ি গমন এবং ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে মা আমিনার মৃত্যু।

৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ : ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল মোত্তালিবের ইন্তেকাল এবং চাচা আবু তালিবের উপর তাঁর প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত।

৫৮২ খ্রিস্টাব্দ : ১২ বছর বয়সে আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রী বুহাইরা কর্তৃক প্রতিশ্রুত শেষ নবী হিসেবে চিহ্নিত।

৫৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ : ১৫ বছর বয়সে হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

৫৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দ : হযরত খাদিজা এর বাণিজ্য প্রতিনিধিরূপে সিরিয়া ও ইয়ামান গমন।

৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ : ২৫ বছর বয়সে বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ।

৬০৫ খ্রিস্টাব্দ : হেরা গুহায় তাঁর ধ্যানমগ্ন জীবনের সূচনা হয়।

৬১০ খ্রিস্টাব্দ : ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ। জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক তাঁকে ওযু ও পবিত্রতা পদ্ধতি প্রদান। কোরআন নাযিলের সূচনা।

৬১০-১৩ খ্রিস্টাব্দ : নবুওয়াতের প্রথম ৩ বছর গোপনে ইসলাম প্রচার। সর্বপ্রথম খাদীজা,, যায়িদ, আলী ও আবু বকর এর ইসলাম গ্রহণ। এরপর উসমান, যুবায়েরসহ ৪০ জনের ইসলাম গ্রহণ।

৬১৪ খ্রিস্টাব্দ : আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দান। নবী ﷺ এর প্রতি আবু লাহাবের পাথর নিক্ষেপ ও সূরা লাহাব অবতীর্ণ।

৬১৫ খ্রিস্টাব্দ : নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে উসমান এর নেতৃত্বে ১৬ সাহাবীর দলের আবিসিনিয়া হিজরত। উমর ও হামযা এর ইসলাম গ্রহণ।

৬১৬-৬১৯ খ্রিস্টাব্দ : ৩ বছর শেবে আবী তালিবে আবদ্ধ জীবন যাপন।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দ : বিবি খাদিজা ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যু।

৬২১ খ্রিস্টাব্দ : পবিত্র মেরাজের সফর এবং নামাজের বিধান লাভ।

৬২২ খ্রিস্টাব্দ : মদীনায় হিজরতের জন্য সাহাবীগণের পতি নির্দেশ জারি। রাসূল ﷺ ও আবু বকর এর মক্কা ত্যাগ এবং গারে সাওরে আশ্রয় এবং মদীনার হিজরত।

১ম হিজরী **৬২২ খ্রিস্টাব্দ :** ইয়াসরীবের পরিবর্তে মদীনা নামকরণ, মসজিদে নববী নির্মাণ, আজান, অযু নামাযের নিয়ম ও জুম্মা প্রচলিত হয়।

২য় হিজরী : যাকাত, রোজা, কিবলা, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, হজ্ব পালনের প্রত্যাদেশ লাভ ও ইসলামের প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ।

৩য় হিজরী : মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদ প্রণয়ন এবং ওহুদের যুদ্ধ।

৫-৬ হিজরী : পর্দা প্রবর্তিত, খন্দকের যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি।

৭ম হিজরী : খাইবার জয়, মুতার যুদ্ধ, মদ হারাম ঘোষণা।

৮ম হিজরী : মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধে ও তায়েফে ইসলামের বিজয় হয়।

৯ম হিজরী : ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক হজ্বের বিধান প্রবর্তন।

১০ম হিজরী :১ লাখেরও বেশি সাহাবীসহ বিশ্বনবী ﷺ বিদায় হজ্বে আরাফাতের ময়দানে মানব জাতির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান।

১১ হিজরী/ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ : নবী ﷺ এর মাথা ব্যথা ও জ্বরের সূচনা। ৬৩ বছর বয়সে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বিশ্বনবী ﷺ এর ওফাত হয়। বুধবার ১৪ রবিউল আউয়াল ভোর রাতে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এর মূল্যবান চল্লিশ হাদীস

হাদীস হচ্ছে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জীবনের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর পবিত্র জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, চরিত্র মাধুর্য সবই সেখানে লিপিবদ্ধ।

এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের ক্ষেত্রে না কখনো ঘটেছে না ঘটবে। তাই তো বিশ্ব মানবতার জন্য তিনিই একমাত্র আদর্শ। তিনি ছিলেন মানবতার এক পূর্ণাঙ্গ রূপ। তিনি শুধু মক্কা মদীনা বা আরববাসীদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুকরণীয়। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ইন্তেকালের ১৪০০ বছর পরও তাঁর হাদীসের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, তথ্য প্রযুক্তির যুগ (Era of Information and Technology)। এই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগেও তাঁর হাদীস এখনও চিরনতুন। বর্তমান আধুনিক জীবনেও হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং এর চর্চা করা অতীব প্রয়োজন। এইজন্য কুরআন অধ্যয়ন করা যেমন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক তেমনি হাদীসের অধ্যয়ন করাটাও জরুরি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এরশাদ করেছেন–

من حفظ على امتى اربعين حديثا فى امر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيمة شا فعا وشهيدا –

অর্থ : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট তাদের ধর্ম সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস প্রচার করবে, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামাতের দিন ফকীহ হিসেবে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে শাফায়াত করব ও সাক্ষ্য দান করব।

তাই এখন আপনাদের সম্মুখে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মূল্যবান চল্লিশ হাদীস পেশ করা হচ্ছে–

১) হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয়ই যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যা সে নিয়ত করে। যে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করে তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হয়। আর যদি কেউ দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য বা কোন মহিলাকে বিয়ের জন্য হিজরত করে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

২) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে আল্লাহ পাক তোমাদের কারো চেহারা বা ধন দৌলতের দিকে তাকান না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও আমলকে। (মুসলিম)

৩) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন ভাল কাজ করার নিয়ত করে, কিন্তু সেটা সম্পন্ন করতে পারে নাই তবুও তার জন্য সওয়াব লেখা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪) হযরত আবু বাকরাহ রা থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যদি দুইজন মুসলমান পরস্পর অন্যায়ভাবে অস্ত্রের দ্বারা বিবাদ সৃষ্টি করে এবং এমতাবস্থায় কোন একজন মারা যায় তবে দুইজনই জাহান্নামী হবে। মহানবীর খেদমতে আরজ করা হল যে, হত্যাকারী (খুনী) জাহান্নামে যাবে, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন যাবে? জবাবে মহানবী বলেন নিহত ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির (খুনীর) অনুগামী। কারণ সে সুযোগ পেলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করত। (বুখারী ও মুসলিম)

৫) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও কুচকুচে কালো চুল বিশিষ্ট এক ব্যক্তি আসল যাকে আমরা কেউই চিনতাম না (স্থানীয় হলে তাকে আমরা চিনতাম) তার মধ্যে ভ্রমণের ক্লান্তির কোন লক্ষণও পরিলক্ষিত হল না। এমনকি তিনি মহানবীর কাছে তার দুই হাঁটুর সাথে হাঁটুকে মিশিয়ে এবং দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে একান্ত আদবের সাথে বসে বললেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন? ইসলাম কি? মহানবী বললেন, আল্লাহ পাক ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন তাঁর রাসূল এই ঘোষণা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, এবং (আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে) হজ্ব সম্পাদন করা। তখন আগন্তুক বলল, আপনি সঠিক বলেছেন। (হযরত উমর (রা.) বললেন) এতে আমরা বিস্মিত হলাম যে, আগন্তুক প্রশ্ন করছে আবার বিজ্ঞের ন্যায় সমর্থনও করছে। এরপর আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল আমাকে ঈমান সম্বন্ধে বলুন? মহানবী বললেন, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং ভাল মন্দ ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস করার নাম ঈমান। আগন্তুক বলল আপনি সঠিক বলেছেন। এরপর সে বলল আমাকে ইহসান সম্বন্ধে বলুন? তখন মহানবী বললেন, আল্লাহ পাকের ইবাদত এমনভাবে কর যেন তাকে দেখছ, যদি এরকম মনে না হয় তবে মনে করবে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। তারপর আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল আমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে বলুন। তখন মহানবী বললেন, প্রশ্নকারী অপেক্ষা আমি অধিক

জানি না। এরপর আগন্তুক পুনরায় জিজ্ঞাসা করল আমাকে অন্তত তার কিছু নিদর্শন বলে দিন। মহানবী বললেন যে, দাসীর গর্ভে মনিব জন্মগ্রহণ করবে, উলঙ্গ, দুঃস্থ গরীব, নগ্নপদ, রাখাল প্রভৃতি পরবর্তীতে বড় বড় দালান কোঠার অধিকারী হয়ে পরস্পর গর্ব করবে। এরপর আগন্তুক চলে গেলেন। এর কিছুক্ষণ পর (অন্য বর্ণনায় তিন দিনের পর) মহানবী হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে উমর! তুমি কি চিনতে পেরেছ এই প্রশ্নকারী কে? হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তিনি হচ্ছেন হযরত জিব্রাঈল (আ.) যিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। (মুসলিম)

৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন তাঁর বান্দা ও রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) হজ্জ করা (৫) রমজান মাসের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

৭) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে, ঈমানের ৭০টিরও অধিক শাখা আছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল এই ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিম্নতম হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

৮) হযরত আব্বাস বিন মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে একমাত্র রব ইসলামকে একমাত্র ধর্ম এবং মুহাম্মদ ﷺ কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। (মুসলিম)

৯) হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দান করে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য দোযখ হারাম করে দেন। (মুসলিম)

১০) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, দুটি বিষয় হবেই। এক ব্যক্তি বললেন হে আল্লাহর রাসূল ঐ বিষয় দুটি কি? মহানবী বললেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে এবং ঐ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামী হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করবে না এবং ঐ অবস্থায় মারা যায় ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

১১) হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসে এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই কাউকে ঘৃণা করে, আর তাঁর উদ্দেশ্যেই দান করে এবং তাঁর উদ্দেশ্যেই কোন কাজ থেকে বিরত থাকে সে ব্যক্তির ঈমান কামেল ও পরিপূর্ণ হয়েছে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

১২) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোন আমলটি উত্তম? জবাবে মহানবী বলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল এরপর? জবাবে বললেন আল্লাহর রাস্তায় (ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য) জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল তারপর? জবাবে মহানবী বললেন, মঞ্জুরকৃত হজ্ব । (বুখারী, মুসলিম)

১৩) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ বলেছেন যে, "আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়েছে, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়েছে, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ কার ঈমান নষ্ট হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন, যার ব্যবহারে তার প্রতিবেশী কষ্ট পায়। (বুখারী, মুসলিম)

১৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন, "যার অন্তরে অনু বা বিন্দু পরিমাণ ও ঈমান থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। (তিরমিযী)

১৫) হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, জান্নাতের একমাত্র চাবি হচ্ছে এই সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। (আহমাদ)

১৬) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মুমিনের মৃত্যুর পর তার সৎকাজ ও সৎব্যবহারের ফল পেতে থাকবে। তার মধ্যে দ্বীনি শিক্ষা যা তিনি নিজে শিখেছেন এবং অন্যের নিকট প্রচার করেছেন বা কোন নেক সন্তান রেখে গিয়েছেন অথবা এমন কোন কিতাব রেখে গিয়েছেন যার দ্বারা লোকদের উপকার হয়, অথবা কোন মসজিদ তৈরী করেছেন বা পথিকের সুবিধা জন্য সরাইখানা তৈরী করেছেন অথবা জনসাধারণের সুবিধার্থে কোন জলাশয় খনন করেছেন। অথবা তাঁর ধন-সম্পদ হতে তিনি জীবিত অবস্থায় কোন দাতব্য কাজ করেছেন যার ফল তিনি মৃত্যুর পরও ভোগ করতে থাকবেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

১৭) হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? (অর্থাৎ ঈমানে বিশুদ্ধতার পরিচয় কি?) মহানবী বললেন যখন কোন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকাজ তোমাকে কষ্ট দিবে তখন তুমি প্রকৃত

মুমিন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল! গুনাহ কি? জবাবে মহানবী বললেন যখন কোন কাজ তোমার অন্তরকে কষ্ট দেয় তাই পাপ। সুতরাং তা বর্জন কর।(আহমাদ)

১৮) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন যাপন করে আর সে উদরপূর্তী করে খায়। (বায়হাকী)

১৯) হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করছেন, যদি কোন ব্যক্তি সঠিকভাবে অজু করে, তাহলে শরীর থেকে সমস্ত গুনাহ (সগীরা) বের হয়ে যায়, এমনকি নখের নিচ হতেও বেরিয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

২০) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতগণ যারা নিয়মিত অজু করে তাদের চেহারায় এমন একটি নূরের জ্যোতি বিকশিত হতে থাকবে। যার চিহ্ন দেখে কিয়ামতের দিনে তাদেরকে সহজে চিনা যাবে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এই উজ্জল নূরের অধিকারী হতে চাও তবে নিয়মিত অযু কর। (বুখারী, মুসলিম)

২১) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের চাবি নামাজ, আর নামাজের চাবি হল পবিত্রতা। (আহমাদ)

২২) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করে এবং অজু শেষে বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন রব নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আরো সাক্ষী দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ হচ্ছেন তাঁর বান্দা ও রাসূল তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজার সবগুলোই খুলে দেয়া হবে। এর যে কোন একটি দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম)

২৩) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন নামাজের একমাত্র চাবি হচ্ছে পবিত্রতা (অযু)। (তিরমিযী)

২৪) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন কোন ব্যক্তি নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বললে যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় অজু না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

২৫) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি যার অনুকরন করবে তাকে তাদের মধ্যেই ধরা হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ)

২৬) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন ঐ ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমাকে দেখেছে এবং ঐ ব্যক্তি তার চেয়েও সাতগুন বেশী সৌভাগ্যবান যে আমাকে দেখেনি তবুও পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। (আহমাদ)

২৭) হযরত জাবীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদের ﷺ এর পথ এবং সর্ব নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত কাজই গোমরাহী (পথভ্রষ্টতার) দিকে টেনে নেয়। (মুসলিম)

২৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হালাল খায়, সুন্নাত মোতাবেক চলে এবং যার ব্যবহারে জনসাধারণ শান্তিতে বাস করে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

২৯) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্বের সময় বলেছেন যে আমি তোমদের মধ্যে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যার অনুসরণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর পবিত্র বাণী কুরআন এবং হাদীসে রাসূল। (মুসলিম)

৩০) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন শিক্ষা করে এবং তার নির্দেশ মত চলে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে সৎপথে পরিচালিত হবে এবং কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ তার জন্য সুস্পষ্ট সহজ হবে।

৩১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত। (তিরমিযী)

৩২) হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা মাতার হক কতটুকু? জবাবে মহানবী বললেন, "তারা তোমাদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ)

৩৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, "সমস্ত দুনিয়াটি হচ্ছে সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

৩৪) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ থাকত তাহলে আমি প্রত্যেক নারীকে তাদের নিজ নিজ স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। (তিরমিযী)

৩৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন যে, দুই প্রকার চোখকে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে (২) আর সে চোখ যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে শত্রু থেকে নিজের দেশ ও ধর্মকে হিফাযতের জন্য সতর্কদৃষ্টিতে রাত্রি জাগরণ করে। (তিরমিযী)

৩৬) হযরত মাহমুদ বিন অলিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য যে ব্যপারে সবচেয়ে বেশী ভয় করছি তা হচ্ছে শিরকে আসগার (ছোট শিরক)। জিজ্ঞসা করা হল হে আল্লাহর রাসূল, শিরকে আসগার (ছোট শিরক) কি? উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রিয়া (লোক দেখানোর জন্য কৃত আমল)। (আহমদ)

৩৭) হযরত শাদ্দাদ ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো জন্য নামায পড়ল সে শিরক করল। যে লোক লোক দেখানো জন্য রোযা রাখল সে শিরক করল। আর যে লোক দেখানোর জন্য সদকা-খয়রাত করল সেও শিরক করল। (আহমদ)

৩৮) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যখন তোমরা ইমামতি করবে তখন নামায ছোট বা সহজ করবে। কেননা তখন তোমাদের সাথে ঐ জামাতে অসুস্থ, দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকেন। আর যখন তোমরা একা নামায পড়বে তখন যত খুশী নামাযের আহকাম আরকান দীর্ঘ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

৩৯) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে তোমরা যখন নামায পড়বে তখন মনের আবেগ নিয়ে আদায় করবে। আর যখন ক্লান্তিবোধ করবে তখন বসে পড়বে। (বুখারী, মুসলিম)

৪০) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে, একাগ্রচিত্তে সামান্য নেক কাজ করলেও সেটা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

এই চল্লিশ হাদীস মুফতী এ আযম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহঃ) কতৃক সংকলিত। এই হাদীসগুলো অনুবাদ ও ব্যখ্যাসহ পাবেন **"হাদীসে আরবাঈন চল্লিশ হাদীস "** নামক কিতাবে।

প্রকাশক

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈদে মিলাদুন্নবী

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের আগমন ঘটলেই সারা দুনিয়ার মুসলমানদের অন্তরে ইশকে রাসূল এর নব জোয়ার জাগে। কারণ এই মাসেই বিশ্ব মানবতার শান্তিদূত, প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, আহমাদে মুজতবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়াতে আগমন করেন। এইজন্য পুরো মাস জুড়ে হামদ-এ-বারী, নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সীরাত আলোচনা, মিলাদ- কিয়ামের মাধ্যমে বিশ্বের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে উদযাপন করে থাকে। কিতাবের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবীর সার্থকতা ও যর্থাথতা তুলে ধরা হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

কুরআনের বাণী

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা হলেন ক্ষমাকারী ও অতীব দয়ালু।

হাদীসের আলো

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ সে আমাকে (মহানবীকে) তার পিতা, মাতা, সন্তান ও সকল মানবজাতি থেকে অধিক মুহাব্বত না করে।

শানে মুস্তাফা

اُمی و دقیق دان عالم
بے سایہ و سایا بان عالم

উম্মী হয়েও সকল কিছুই জানেন তিনি

ছায়াহীন হয়েও তাঁর দয়ার ছায়া সকল সৃষ্টির উপর বিরাজমান

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈদে মিলাদুন্নবী প্রতি আরবী বছর রবিউল মাসের ১২ই তারিখ সমস্ত বিশ্বের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে উদযাপন করে থাকে। এই দিনে তারা প্রিয়নবীর বিশ্বের বুকে আগমনের কারণ হেতু আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে ও আনন্দ খুশি পালন করে । বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর এই সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণ ও ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে প্রিয়নবীকে মুহাব্বত করা ও তার সুন্নাহর অনুসরন করা। ঈদে মিলাদুন্নবী এবং মিলাদ মাহফিল এই দুটো কাজই আমাদের সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার কাজ সুন্দরভাবে পালন করছে।

তবে দুঃখের বিষয় যে বর্তমান সমাজে নানা ব্যক্তি নানা লোক এই ঈদে মিলাদুন্নবী কে হারাম, বিদআত, কুফর এমনকি শিরক পর্যন্ত বলে । এখন এই বইয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী সম্বন্ধে যুক্তি ও দলিল উপস্থাপন করা হবে।

ঈদ (عِيْدٌ) আরবী শব্দ এবং আরবী ভাষায় সেই দিনকে ঈদ বলা হয় যে দিন মানুষ আনন্দ ও খুশী উদযাপন করে বা সেই দিনটি যখন মানুষের জীবনে ফিরি আসে। ঈদ (عِيْدٌ) আরবী শব্দ যার মাদ্দাহ বা শব্দমূল যথাক্রমে ع . ي . د দ্বারা গঠিত। এবং জিনসে صحيح ।

عيد শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে

- اَلرُّجُوْعُ : প্রত্যাবর্তন করা।
- اَلْفَرَحُ : আনন্দ।
- اَلْعِيَادُ : ফিরে আসা।

শাব্দিক দিক দিয়ে ঈদ বলতে বুঝানো হয় আনন্দ বা খুশি। অথবা কোন দিন যখন মানুষ আনন্দ উদযাপন করে তা যখন মানুষের জীবনে ফিরে আসে। বিখ্যাত আরবী অভিধান المعجم الوفى গ্রন্থটিতে অভিধানবেত্তা ঈদ কথাটিকে আনন্দ বা উৎসব হিসেবে নিরূপণ করেছেন।

মিলাদ مِيْلَادٌ কথাটি আরবী مَوْلُدٌ মাওলুদ থেকে এসেছে এবং এই দু শব্দেরই আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জন্ম। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান লিসানুল আরব لسان العرب গ্রন্থে মিলাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জন্ম, জন্মদিন, জন্মকাল। এছাড়াও المعجم الوفى গ্রন্থকার مَوْلُدٌ কথাটির অর্থ জন্ম বা উৎপন্ন হিসেবে নিরূপিত করেছে।

সাধারণ ইসলামী পরিভাষায় মিলাদুন্নবী অর্থ হলো হুযুর হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্ম, জন্মকাল এবং তাঁর জন্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি স্মরণ করা তথা তার পবিত্র সীরাতের আলোচনা করা।

ঈদে মিলাদুন্নবী কথাটির অর্থ হচ্ছে হুযুর হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্ম ও জন্মকাল ও তথা সীরাত সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তাঁর দুনিয়ায় আগমন উপলক্ষে আনন্দ ও খুশি পালন করা (শরীয়ত সম্মতভাবে)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা হয়। যেমন-

☆ মাওলুদুন-নবী (আরবী/ উর্দু)
☆ মিলাদুন-নবী (আরবী/ উর্দু)
☆ ঈদুল মাওলুদুন-নবী (হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্মের খুশি ও আনন্দ)
☆ ঈদে-মিলাদুন-নবী (উর্দু)
☆ মাওলুদুন-নবওয়ী (হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্ম আলজেরিয়ান/ আফ্রিকা অঞ্চল)
☆ ইয়াওমুন-নবী (হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর দিন আরবী/ আরব, ইরাক)
☆ মাওলুদুর-রাসূল (হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্ম , মালেশিয়া/ মালে)
☆ মাওলুদ শরীফ (তুর্কী)
☆ জহুরে পায়গাম্বারে আকরাম – (ইরান/ ফার্সী)
☆ আল মাওলুদুন-নবী - (মিসর / মিসরীয় আরবী)
☆ মহানবী জয়ন্তি (সংস্কৃত, হিন্দী / ভারত)

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ الله   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ الله

পবিত্র কুরআন শরীফে নবীর আগমনের সংবাদ

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দুনিয়াতে আগমন করে ইসলামের আলো ছড়াবেন তা মহান আল্লাহ পাক বহুকাল পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সকল নবী রাসূলগণের কাছ থেকে আল্লাহ এ মর্মে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন এ সম্বন্ধে কুরআনে আল্লাহ বলছেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ إِصْرِىْ قَالُوْا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(سورة آل عمران-٨١)

অর্থ ঃ "স্মরণ কর আল্লাহ নবীদের নিকট হতে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং কর্মকৌশল ও বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছি, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল আসবেন যিনি তোমাদের নিকট যে কিতাব আছে তাকে সত্যায়িত করবে তবে তাঁর প্রতি ঈমান তোমরা অবশ্যই ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। এই কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কি এর ওয়াদা করছ এবং এই সম্বন্ধে আমার নিকট হতে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ?" তারা বলল, "হ্যাঁ আমরা ওয়াদা করছি।" আল্লাহ বললেন "তবে তোমরা সাক্ষী থাক আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।" (সূরা আলে ইমরান : ৮১)

এই সূরার এই আয়াত সহ তৎসংশ্লিষ্ট আয়াত গবেষণা করলে এটা পরিস্কার হয় যে এখানে মহান আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আগমন সম্বন্ধে সকল নবী রাসূলগণকে অবহিত করে তাদের কাছ তাকে সাহায্য করার ওয়াদা নিলেন এবং শুধু ওয়াদা নয় নবীদেরকে বিশ্বনবীকে সাহায্য করারও নির্দেশ দেন এবং ওয়াদা করার পর বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে তাদের এই ওয়াদা গ্রহণের সাক্ষী হলেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে আরো বলছেন,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ (سورة التوبة ١٢٨-١٢٩)

অর্থ ঃ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনগণের প্রতি সে স্নেহশীল ও দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তরা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তারই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি ।

(সূরা আত তাওবা : ১২৮-১২৯)

মহান আল্লাহ যে রূপে ও যে উদ্দেশ্যে আমাদের প্রিয়নবীকে প্রেরণ করেছেন সে সম্বন্ধে বলেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ (سورة الأنبياء ١٠٧)

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○

(سورة سبأ ٢٨)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, , তবে অনেকেই তা জানে না। (সূরা সাবা : ২৮)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ

وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ○ (سورة الأحزاب ٤٥-٤٦)

অর্থ ঃ হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়ক রূপেএবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আল-আহযাব:৪৫-৪৬)

এখানে কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হল যেখানে মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয়নবী খাতামুন নাবীয়্যিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুনিয়াতে আগমন ও তাঁর প্রেরণ এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন।

এই আগমন ও জন্মকেই আরবীতে মাওলুদ এবং উর্দু ও বাংলা ভাষায় মিলাদ শরীফ বল হয়। এবং হুযুর হযরত মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আমাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○ (سورة القلم٤)

অর্থ ঃ "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী" (সূরা আল-কলম : ৪)

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত এবং তিনি আমাদের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ সম্বন্ধে দুনিয়ায় আলেম সমাজের কোন দ্বিধা বিভক্তি নেই।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُولِ الله   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُولَ الله

মহান আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহ

মহান আল্লাহ পাক আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছপালা, ফুল-ফল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি অসংখ্য ও অগণিত জিনিস ও নেয়ামত দ্বারা এ সৃষ্টিকূলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। এই বিরাট সৃষ্টির প্রতিটি নিজ নিজ মহিমায় উদ্ভাসিত। কিন্তু এই বিরাট সৃষ্টিকূলকে তথা তার নেয়ামতরাজিকে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন কেবলমাত্র মানুষের জন্য তাদের সুখ ও শান্তির জন্য। তার সৃষ্টি তথা অপর অনুগ্রহের ভাণ্ডার এতই ব্যাপক যে কোন আদম সন্তানের পক্ষে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝ (سورة الكهف ١٠٩)

অর্থ : বলুন: আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে; সাহায্যার্থ অনুরূপ আরেকটি কালির সমুদ্র এনে দিলেও। –(সূরা কাহাফ : ১০৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন–

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝ (سورة إبراهيم ٣٤)

অর্থ ঃ তোমাদের চাওয়া প্রত্যেকটি জিনিসই তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবে না। মানুষ বড়ই জালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইব্রাহীম : ৩৪)

তাই মানুষ হিসেবে মহান আল্লাহ পাকের এই অগণিত নেয়ামতসমূহকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আল্লাহ আরো বলেন,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○ (سورة الرحمن ١٣)

অর্থ ঃ "অতএব তোমরা উভয়ে (জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।" (সূরা আর রাহমান : ১৩)

আর তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের শোকর গোজারীর ব্যাপারে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে একটি ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ○ (سورة إبراهيم ٧)

অর্থ : তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।
(সূরা ইবরাহীম : ৭)

অতএব বর্ণিত আয়াতসমূহের মধ্যে একটি বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে, সেটা হলো মহান আল্লাহ পাকের অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সেটা ছোট হোক বা বড় যে কেনো নেয়ামতের শোকরগোজারির বিনিময় আল্লাহ পাক সেই নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দিবেন।

কিন্তু এরই সাথে আল্লাহ পাক একটি সাবধান বাণী, সতর্কবাণী জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হবে তার জন্য জাহান্নামের কঠোর শাস্তি অবধারিত।

رَبِّ سَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُولَ اللهِ

মহান আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত

আমরা যখনই মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ও তার নেয়ামতের কথা স্মরণ করি তখন একই সাথে আমাদের স্মরণ করা উচিত তার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতের। সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করলেই আমরা বুঝি কেবল আকাশ-বাতাস, নদী-নালা, ফুল-ফল ইত্যাদি। কিন্তু তাঁকে স্মরণ করতে ভুলে যাই যার উসিলাতে আমরা এই অপার অনুগ্রহরাজি পেয়েছি। তিনি হচ্ছেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, সারকারে দোআলম, নূরে মুজাস্সাম, আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ। সেই পেয়ারা হাবীব এর জন্যই আমরা এত নেয়ামত পেয়েছি। তাঁর সম্বন্ধে তো স্বয়ং আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে বলেছেন–

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

"আপনাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না থাকলে আমি কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"

এই যে বিরাট সৃষ্টি সম্ভার মহান আল্লাহ পাক তৈরী করে রেখেছেন সেটা কিন্তু তার দৃষ্টিতে একেবারে তুচ্ছ, নগণ্য। আল্লাহ পাক তো পবিত্র কুরআনেই ইরশাদ করেছেন–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ○(سورة النساء ٧٧)

অর্থ : এই দুনিয়াবী সম্পদ সবকিছুই তুচ্ছ, নগণ্য। (সূরা নিসা : ৭৭)

কিন্তু অন্যদিকে আমাদের পেয়ারা হাবীব হযরত রাসূলে আকরাম সা. এর সম্মান ও চরিত্রকে আল্লাহ কিভাবে আখ্যায়িত করেছেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○ (سورة القلم-٤)

অর্থ ঃ "আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী" (সূরা আল-কলম : ৪)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এটি কিন্তু কোন মামুলী ও সামান্য বিষয় নয়। যেখানে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই বিশাল আকাশ, বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলকে সামান্য বলে আখ্যায়িত করেছেন, অন্যদিকে আমাদের পেয়ারা নবীর চরিত্রকে Character কে আযীম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এবং আমরা তথা উম্মতে মুহাম্মদীর উপর মহান আল্লাহর বড় মেহেরবানী যে তিনি আমাদেরকে তার নবীর উপর ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন। নিজেই বিবেচনা করে দেখুন যেখানে মক্কার কুরাইশদের কাফের আবু জেহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া বিন খালফ, ওকাবা ইবনে আবু মুয়ীত, মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই, আবদুল্লাহ বিন জুল-খুয়াসরা আত তামীমী, তারা তো নবীজীকে সচক্ষে দেখেছিল প্রিয়নবীর জন্ম, শৈশবকাল, যৌবন, বিবাহ ইত্যাদি তাদের চোখের সামনেই হয়েছিল। এমনকি তারা সচক্ষে প্রিয়নবীর মুজেযা সমূহকে প্রত্যক্ষ করেছিল। কিন্তু এটা তাদের পরম দুর্ভাগ্য যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনতে পারে নি। আবু লাহাব তো নবীজীর আপন চাচা ছিল, তাদের উভয়ের বাসা পাশাপাশি ছিল। দেয়ালের একদিকে নবীজীর বাসা ও অন্যদিকে আবু লাহাবের বাসা। প্রিয়নবীর প্রতিবেশী ও আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও সে ঈমান আনতে পারে নি।

অথচ হযরত বেলাল (রা) কে হাবশা থেকে, হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে ইরান থেকে, হযরত হাসান (রহ.)-কে সুদূর বসরা থেকে এসে ঈমান লাভ করার তৌফিক পেয়েছিলেন। এই বিষয়কে মাওলানা রুমী মসনবী শরীফে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

بلال از حبش صہیب از روم حسن از بصری

چه بو جہل در مکہ بود ایں چہ بولہب ایست

বেলাল হাবশা থেকে, শোয়ায়েব রোম থেকে, হাসান বসরা থেকে ঈমান আনতে পেরেছে।

অথচ আবু জেহেল মক্কায় থেকেও ঈমানের স্বাদ পেল না।

অন্যদিকে আমরা যারা মুসলমান ও আখেরী নবীর উম্মতী হতে পেরেছি, আমরা নবীর আত্মীয় নই বা প্রতিবেশীও নই। আমরা তো সচক্ষে নবীর দেখার সুযোগ থেকেও মাহরুম রয়েছি। কিন্তু তারপরও মহান আল্লাহ দয়া করে মায়া করে, সাড়ে চৌদ্দশ বছর পর, পবিত্র মক্কা নগরী থেকে সাড়ে তিন হাজার মাইল দূরে বাংলাদেশে বসেও যে তার ও তাঁর হাবীবের উপর ঈমান আনার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য সদাসর্বদা আমাদের তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

একই বিষয় সম্বন্ধে রাসূলে আকরাম ﷺ এরশাদ করেছেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُوْبِى لِمَنْ رَآنِي وَطُوْبَى سَبْعَ مَرَّاتِ لِمَنْ لَمْ يَرَانِىْ بَلْ اٰمَنِ بِىْ ○ (احمد)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন ঐ ব্যক্তি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমাকে দেখেছে এবং ঐ ব্যক্তি তার চেয়েও সাতগুন বেশী সৌভাগ্যবান যে আমাকে দেখেনি তবুও পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। (আহমাদ)

একবার এক সাহাবী রাসূলে আকরাম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল আমরা তো আপনাকে দেখেছি, আপনার হাতে হাত রেখে ঈমান এনেছি, আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছি, আমাদের চেয়েও কি অধিক সৌভাগ্যবান কোন লোক হবে? জবাবে মহানবী ﷺ বলেন হ্যাঁ আখেরী যামানার উম্মতরা তোমাদের চেয়েও অধিক সৌভাগ্যবান। কারণ তোমরা আমাকে দেখে দেখে ঈমান এনেছ, আর তারা আমাকে দেখেনি, কেবল আমার নাম শুনেছে এবং সেই নামের উপর তারা ঈমান আনবে।

একই বিষয় সম্বন্ধে অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক মুহাব্বাতকারী লোক তারাই হবে যারা আমার পর জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ এই আকাঙ্ক্ষাও করবে যে, তার পরিবার পরিজন এবং মাল সম্পদের বিনিময় হলেও যেন সে আমাকে দেখতে পেত।" (মুসলিম)

তাই আল্লাহ বলেছেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(سورة آل عمران ١٦٤)

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে তিনি একজন নবী বানিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

নবী রাসূলরা আখেরী নবীর উম্মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন

বলা হয় যে, জিনিস যত কষ্ট বা পরিশ্রমে পাওয়া যায় মানুষ সেই বস্তু বা জিনিসকেই ততই বেশী মূল্য দেয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হচ্ছে সহজেই বা না চাইতেই মানুষ যা পায় তার প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করে না। এই সত্যটি আমাদের সমাজে তাকালেই পরিষ্কার হয় যে, আমরা না চাইতেই আখেরী নবীর উম্মতী হতে পেরেছি। এইজন্যই আমরা তাকে গুরুত্ব বা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি না। অথচ আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আখেরী নবী হিসেবে পেয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের শোকর গোজারী করা, তাকে এবং তাঁর প্রিয় হাবীবকে সম্মান, মুহাব্বত ও মান্য করা।

আমাদের প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে যে আমাদেরকে তিনি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺএর উম্মত হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আল্‌হামদুলিল্লাহ আমরা এমন উম্মতী হতে পেরেছি যার আল্লাহ শিরক ছাড়া সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। শুধু তাই নয় কিয়ামতে আমরাই সবার আগে জান্নাতে যাব। এ সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হাদীসে মহানবী বলেছেন, "আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ যমানায় আগমন করেছি, কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম হাযির হবো এবং আমরাই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ আমাদেরকে উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা অতুলনীয়। এমন কি নবী রাসূলদের ও আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে দুনিয়াতে আসার।

হযরত আদম (আ.) এর তওবা কবুল হলো প্রিয়নবীর অসীলায়

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত আদম (আ.) থেকে ভুলবশত যখন অপরাধ প্রকাশ পেল, তখন তিনি প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন মহান আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিভাবে চিনলে? অথচ এখন পর্যন্ত আমি তাকে মানবরূপে সৃষ্টি করিনি। হযরত আদম (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যখন কোন মাধ্যম ছাড়া নিজ কুদরতে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার কায়ায় প্রাণ ফুঁকে দিলেন, তখন আমি আমার মাথা উপরের দিকে উত্তোলন করে আরশের পায়ায় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ" লিখিত দেখতে পেলাম। তখন আমি জানলাম যে, এ ব্যক্তি সৃষ্টিকুলের মধ্যে আপনার কাছে খুব প্রিয় কেননা, আপনি তাঁর নামকে নিজের নামের সাথে উল্লেখ করেছেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম! তুমি সত্যই বলেছ, নিশ্চয়ই সে আমার নিকট অত্যধিক প্রিয়। তুমি যেহেতু ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য মুহাম্মদের অসীলা দিয়েছ। তাই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। মুহাম্মদের কারণেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বায়হাকী)

رب سلم على رسول الله   مرحبا مرحبا رسول الله

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়ার ফসল হচ্ছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ

আমাদের মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ) মহান আল্লাহর দরবারে দোআ করেছিলেন যেন মহান আল্লাহ তাঁর বংশ থেকে এমন এক রাসূল প্রেরণ করেন যিনি হবেন সর্ব গুণে গুণান্বিত এবং সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের আলোয় আলোকময় করবেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই দোআটি পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে,

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ (سورة البقرة ١٢٩)

অর্থ ঃ হে রব, এই জাতির কাছে এদের মধ্য থেকেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাবও হিকমতের শিক্ষা দিবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ। (সূরা-আল বাকারা-১২৯)

এই আয়াতের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর আবেদন রয়েছে প্রিয়নবীকে তারই বংশে পাওয়ার জন্য। মহান আল্লাহ তার এই আকুতির জবাব এভাবে দিচ্ছেন–

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ (سورة الجمعة ٢)

অর্থ ঃ তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করে শুনান তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত, যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।(সূরা আল জুমুআহ : ২)

এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) তাঁর "নশরুত্তীব ফিজিকরিন্নাবিয়্যিল হাবীব" এবং মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহঃ) নিজ "যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা" উল্লেখ করেন যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর আবেদন এর জবাব মহান আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন-

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗٓ أَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○(سورة الصف٦)

অর্থ ঃ আর স্মরণ কর, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা বলল : হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের কাছে আলাহ্র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম আহমদ; অতঃপর যখন তিনি স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল : এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (সূরা আছ ছাফ : ৬)

তাই মানুষ হিসেবে, উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে মহান আল্লাহ এবং তাঁর এই বিরাট নেয়ামতকে অস্বীকার করার কোনো পথ নেই।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এটাই প্রতীয়মান করে যে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া কবুল করেন এবং তার বংশ থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। আমরা যদি নবী রাসূলদের ইতিহাস দেখি তবে এটা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আল্লাহ পাক ইব্রাহিম (আ) এই দোয়ার ফলশ্রুতিতেই তিনি দুনিয়াতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর বংশ জন্ম দান করুন।

আল্লাহ তার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ) এই দোয়ার ফলে তার ছেলে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশ থেকে আমাদের প্রিয় নবীকে দুনিয়াতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ ঘটনা জানার পর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আরেক ছেলে হযরত ইসহাক (আঃ) কিছুটা মনঃক্ষণ্ন হন। তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ হযরত ইসহাকের (আ) বংশ দিয়ে অন্যান্য নবী রাসূল প্রেরণ করেন এবং হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশ থেকে কেবল সাইয়্যেদেনা হযরত মুহাম্মুদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রেরণ করেন। তাই যদি আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পারব যত নবী রাসূল হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর পর এসেছেন (হযরত ইসমাইল ব্যতীত) তারা সবাই হযরত ইসহাক (আঃ) এর বংশ থেকে এসেছেন এবং এরা বনী ইস্রাইল হিসেবে পরিচিত। এমনকি এসম্বন্ধে আল্লাহ কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন যা সূরা বনী ইস্রাইল নামে খ্যাত। তাই দেখা গেল যে নবী রাসূলগণ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে তার বংশ থেকে আসার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।

হযরত মূসা (আঃ) উম্মতে মুহাম্মদীর এমন বৈশিষ্ট্য সম্মান ও মর্যাদার কথা শুনে তিনি ও উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে দুনিয়াতে আসার আকাক্ষা পোষণ করলেন। কিন্তু বিধির বিধানে তা সম্ভব নয়। তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, কিয়ামতে হযরত মূসা (রাঃ)-এর হাশর হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে হবে।

হযরত ঈসা (আঃ) নিজেও উম্মতে মুহাম্মদী হতে চেয়েছিলেন উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা জানার পর। আল্লাহ তার এই মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন এবং আখেরী যুগে তাকে নবী নয় বরং একজন উম্মতে মুহাম্মদী রূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য কুরআনে বলেছেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ○

(سورة يونس -٥٨)

অর্থ ঃ হে নবী বলো, এ জিনিসটি যে তিনি তাদের পাঠিয়েছেন এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার মেহেরবাণী। অতএব এজন্য তা লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করেছে সে সবের চেয়ে এটা অনেক ভাল।

(সূরা ইউনুস : ৫৮)

নিজ আগমনের ধারাবাহিকতা হিসেবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এরশাদ করেছেন–

عَنْ قَتَا دَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُرسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ اَوَّلُ النَّاسِ فِى الخَلقِ وَا خِرُهُم فِى البَعْثِ ○(راوه ابن سعد)

অর্থ ঃ হযরত কাতাদা (রঃ) থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, সৃষ্টির দিক থেকে আমি সর্বপ্রথম এবং নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার দিক থেকে আমি তাদের সর্বশেষ।

(ইবনে সা আদ)

এছাড়া অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আরো বলেন–

عَنْ العِرْ بَا ضِ بن سَا رِيْةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ عَبْدُ اَللّٰهِ وخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى بِيْ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ○(أحمد)

অর্থ ঃ হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়াহ (রঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "তখন থেকে আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং নবীকুলের সর্বশেষ নবী, যখন হযরত আদম (আঃ) পানি ও মাটির মধ্যে মিশ্রিত ছিল। আমি তোমাদেরকে আরো জানাচ্ছি যে আমি হচ্ছি আমার পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়ার প্রতিফল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ, আর আমার মাতার স্বপ্ন যা তিনি দেখেছেন।" (আহমদ)

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা এটি আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে প্রিয় নবীর উম্মত হবার জন্য নবী রাসূলগণ কেমন উদগ্রীব ছিলেন। তারা

আল্লাহর কাছে দোয়া করেও উম্মতে মুহাম্মদী হতে পারেননি আর আমরা আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে সেই আখেরী নবীর উম্মত হতে পেরেছি। এটি আল্লাহর কত বড় নেয়ামত কত বড় অনুগ্রহ তা বলে শেষ করা যাবে না।

তাই তো মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ○ (سورة الضحى ١١)

অর্থ ঃ এবং আপনি আপনার রবের নেয়ামতের কথা বর্ণনা করুন।

(সূরা দোহা ঃ ১১)

উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তার নেয়ামতের কথা বলেছেন এবং শুধু তাই নয় সূরা ইউনুসে এবং সূরা দোহাতে আল্লাহ বলছেন তার নেয়ামত ও অনুগ্রহের শোকর করা, তার জন্য খুশি হওয়া ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ○ (متقف عليه)

অর্থ ঃ হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে, আর কাউকেও দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে রোব (ভীতি) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যেখানেই নামাযের সময় হয় যাবে, সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না, (৪) আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবী প্রেরিত হয়েছেন কেবলমাত্র আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য। (বুখারী মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে নিজ পরকালীন মর্যাদা সম্বন্ধে প্রিয়নবী ﷺ বলেন,

اِذَ كَا نَ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ كُنْتُ اِمَا مَ النَّبِيِّيْنَ وَ صَاْ حِبَ شَفَا عَتِهِم غَيْرَ فَقْرٍ ○

(ترمزی)

অর্থ ঃ কেয়ামতের দিন আমিই হবো নবীদের ইমাম ও মুখপাত্র এবং তাদের জন্য শাফায়াতের অধিকারী। এতে আমার কোন অহংকার নেই। (তিরমিযী)

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা উপরের যাবতীয় আলোচনার পর এটিতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আমাদের জন্য। তাই যে রাতে আমরা হুযুর হযরত মুহাম্মদ ﷺ তথা সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে বড় নেয়ামত পেয়েছি তার জন্য কি আল্লাহ দরবারে খুশি ও আনন্দ তথা শুকরিয়া আদায় করা কি উচিত নয়?

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষ করে উম্মাত মুহাম্মাদীর উপর অসংখ্য অন্যান্য অনুগ্রহ করেছেন। যেমন–

- এই উম্মতের জন্য আল্লাহর তার দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছেন ও তার নেয়ামতসমূহকে পূর্ণ করে দিয়েছেন।
- এই উম্মতের উপর হতে আল্লাহ দুঃসাধ্য ও কষ্টদায়ক ব্যবস্থা প্রত্যহার করে নিয়েছেন।
- এই উম্মতের কাতারকে ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় মর্যাদা দেয়া হয়েছে।
- এই উম্মতের জন্য গনীমতের মালসমূহ হালাল করা হয়েছে।
- এই উম্মতকে জুমার নামায দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে।
- এই উম্মতের বর্ণনা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে রয়েছে।
- এই উম্মতই সকল নবী রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে।
- এই উম্মতই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- এই উম্মতের একদল সর্বদা সত্য ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকবে।
- এই উম্মতের প্রতিটি নেকীকে আল্লাহ দশ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবেন।

উম্মতে মুহাম্মদীর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এখানে সামান্য কয়েকটিই উল্লেখ করা হল। তাছাড়া লাইলাতুল কদর, শবে বরাত, শবে মেরাজ ও কুরআন শরীফ এই সব মহান ও বিরাট নেয়ামত আমরা পেয়েছি সবগুলোই আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে উপহার হিসেবে দিয়েছেন এবং আমরা

তারই মাধ্যমে এই উপহার গুলো পেয়েছি বরং মহানবীকে যেহেতু আমরা উপহার হিসেবে পেয়েছি তাই আমরা সেগুলোকে পেয়েছি।

তাই এটা কি আমাদের কুরআনী তথা ঈমানী দায়িত্ব যে, যে নবীর জন্য আমরা আল্লাহর এত অসংখ্য ও অগণিত নেয়ামতসমূহ পেয়েছে সেই নবীর দুনিয়াতে আগমনের দিন তথা ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা। যেখানে আল্লাহ নিজেই বলছেন আনন্দ ও খুশির মাধ্যমে তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে। তবে এখানে একটি কথা স্পষ্ট যে আনন্দ ও খুশি করার হবে শরীয়তের সীমার মধ্যে।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

পবিত্র কুরআন শরীফে ঈদ কথাটির ব্যবহার

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরো কুরআনে ঈদ কথাটি কেবল এক জায়গায় ব্যবহার করেছেন। সেটি কোরআন শরীফে এভাবে এসেছে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ (سورة آل عمران ١٦٤)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদের উপর আকাশ থেকে একটি খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন, যা আমাদের জন্য এবং আমাদের আগের পিছের সবার জন্য আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে গণ্য হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আপনি আমাদের জীবিকা দান করুন এবং আপনিই সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী। (সূরা আল মায়েদা-১১৪)

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা, উপরের আয়াতে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছিলেন যেন আল্লাহ তাঁর উম্মতীদের জন্য খাদ্য ভর্তি খাঞ্জা (দস্তর খান) বা ডিস প্রেরণ করেন যাতে সেটা তাদের জন্য ঈদ বা আনন্দের উপলক্ষ হয়।

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে ঈদ ﷺ কথাটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ খাদ্যের মাধ্যমে জীবিকার নেয়ামত দান করতেন এখন চিন্তা করুন সেটা হযরত ঈসা (আ) ও তার উম্মতীদের জন্য ঈদের ন্যায় তুলনীয়। আর যেটি সৃষ্টি কুলের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হুযুর হযরত মুহাম্মদ ﷺ সেই নবীর দুনিয়ায় আগমন কি আনন্দের কারণ তথা ঈদের কারণ নয়।

একজন সত্যিকারের মুমিনের জন্য প্রতিটি দিনই ঈদের দিন। কারণ সে প্রতিদিনই আল্লাহর নেয়ামত লাভ করছে এবং তার শুকরিয়া আদায় করছে। এবং আলোচ্য আয়াতে কুরআন মাজীদই এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে মুমিনের জন্য প্রতিটি আনন্দ ও খুশির দিনই ঈদ। তাহলে সৃষ্টিকুলের সবচেয়ে বড় নেয়ামত যার জন্য আমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, রমজান, কুরবানী, পবিত্র কুরআন শরীফ ইত্যাদি পেয়েছি এমনকি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার এর মত দুটো ঈদ তথা খুশির দিন পেয়েছি তাহলে যার জন্য আমরা এইগুলো পেয়েছি সেই প্রিয়নবী এর বিশ্বের বুকে আগমন করার দিন কি কোন ঈদের দিনের চেয়ে কম?

رب سلم على رسول الله   مرحبا مرحبا رسول الله

ঈদে মিলাদুন্নবী হাদীসের আলোকে

বিশ্বমানবতার নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, সারকারে দোআলম, নূরে মুজাস্‌সাম, আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এর জন্মের সময় ও তৎসংলগ্ন ঘটনা প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস রয়েছে। এখানে এরূপ কিছু হাদীসের আলোচনা তুলে ধরছি–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِى آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا ، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِى كُنْتُ فِيهِ ○

(صحيح البخارى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের সর্বোত্তম যামানায়ই আমার জন্ম ও প্রেরণ হয়েছে। আর যামানার মাহাত্ম্য (হযরত নবী করীম ﷺ এর জন্ম থেকে) পর্যায়ক্রমে যুগের পর যুগ ধরে এসেছে। এমনকি যে যামানায় আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সে যামানাই সর্বোত্তম যামানা। (বুখারী)

عن واثلة بن الأسقع رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفَى مِنْ وَلَدِ اِبْرَ اهِيْمَ إِسْمَعِيْلَ وَإِصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيْلَ بَنِى كَنَا نَةَ وَإِصْطَفَى مِنْ بَنِى كَنَا نَةَ قُرَ يْشاً وَإِصْطَفَى مِنْ قُرَ يْشاً وَإِصْطَفَى نِى بَنِى هَا شِمٍ ○

(مسلم و ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত ওয়াছিলাহ ইবনে আসকা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাঈলকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করেছেন। আর ইসমাঈলের বংশের সন্তানদের মধ্যে কিনানার সন্তানদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। আর কিনানার সন্তানদের মধ্যে কুরাইশদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন। আর কুরাইশদের সন্তানদের মধ্যে হাশেমকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। আর হাশেমের বংশ ও সন্তানদের মধ্যে আমাকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন। (মুসলিম, তিরমিযী)

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

ঈদ কথাটির অর্থ হাদীসের আলোকে

ঈদ কথাটি সম্বন্ধে বুখারী শরীফের একটি মাশহুর হাদীস আছে যা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন এক ইয়াহুদী ব্যক্তি হযরত উমরকে বলল আপনাদের কিতাবে একটি চমৎকার আয়াত আছে যা পাঠ করা হয়। ঐ আয়াতটি যদি আমাদের ইয়াহুদী সমাজের প্রতি নাযিল হত তাহলে ঐ দিনটিকে আমরা খুশির উৎসব পালনের দিন হিসেবে পালন করতাম। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন কোন আয়াত? ইয়াহুদী বলল সেটি হচ্ছে-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ○

(سورة المائدة ٣)

অর্থ ঃ আজকের দিনে তোমাদের জন্য আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকেও পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান রূপে মনোনীত করলাম। (সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৩)

তখন হযরত উমর (রা) বললেন সে দিনটিকে আমরা ভালভাবেই জানি। আর সেই স্থানসমূহ ও আমাদের পরিচিত যে স্থানে নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর এই আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি জুমার দিন আরাফাত ময়দানে উপস্থিত ছিলেন।

অন্য রেওয়াতে এসেছে যে হযরত উমর (রাঃ) সেই ইহুদীকে বলেছিলেম যে তোমরা তো সেদিন একটি ঈদের ব্যাপারে বলছ অথচ সেদিন একই সাথে আমাদের দুটি ঈদ, একটি হচ্ছে শুক্রবার এর জন্য ও অপরটি হচ্ছে আরাফাতের দিন এর জন্য।

অতএব পাঠকবৃন্দ এই হাদীস দ্বারা আমরা জানতে পারি যে শুক্রবার ও ঈদ হিসেবে গণ্য এবং আরাফাতের দিনকেও ঈদ রূপে গণ্য করা হয়। ইমাম নববী

ও অনুরূপ বলেছেন। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ প্রমাণই পাওয়া যায় যে সব সময় আনন্দের দিন নির্ধারণ ও পালন করা যায়। অতএব আমরা যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর দুনিয়াতে আগমনের দিনকে ঈদ ও আনন্দ উৎসবের দিন হিসেবে উদযাপন করি তাহলে তা শুধু বৈধ হবে না, বরং তা হবে আরো উত্তম কাজ যদি তাতে কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী কাজ না হয়।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মের কারণে সোমবারের ফযীলত

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন সোমবারের দিন। তাই এই সোমবারের অনেক ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে। সোমবারের ফযীলত সর্ম্পকে একটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন "রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, আর সোমবার দিন তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। মক্কা থেকে মদীনার দিকে সোমবার হিজরত করেন, আর মদীনায় প্রবেশ করেন ও সোমবারের দিন এবং হাজরে আসওয়াদকে তার স্থানে তিনি নিজ মুবারক হস্ত দ্বারা সংস্থাপন করেন সোমবার দিন।" (মুসনাদে আহমাদ)

এ সম্বন্ধে আরেকটি হাদীস এসেছে, সহীহ মুসলিমে তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সোমবারের দিন রোযা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

زَاكَ يَوْمُ وَ لَدْتُّ

"ঐ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।"

এখানে দুটি হাদীস দ্বারা সোমবারের মাহাত্ম্য ও ফযীলত সর্ম্পকে অবহিত হওয়া যায়। শুধু তাই নয় প্রিয়নবী সোমবারে রোযা রেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকেও অনুমতি দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন রোযা রাখার জন্য। এর মাধ্যমে এটাও পরিষ্কার হলো যে নবী নিজের জন্মের শুকরিয়া আদায় কল্পে নিজের জন্মের দিনে রোযা রেখেছেন। তারই অনুকরণে যদি সোমবার দিন মিলাদ মাহফিল করা হয় যাতে কোন রকম শরীয়াতের খেলাফ কাজ না হয় তাহলে তা করা মুস্তাহাব হবে।

এক্ষেত্রে অনেক সময় মিলাদ বিরোধীরা এই যুক্তি দাঁড় করায় যে প্রিয়নবী সোমবারে কেবল রোযা রেখেছেন তাই রোযা রাখা ছাড়া অন্য কোন এরকম কাজ করা যাবে না। তাদের এই প্রশ্নের জবাব হলো এইভাবে যে নবী করিম ﷺ যদি ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন আমল যদি কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময়ে করে থাকেন তাহলে তা পালন করা অবশ্যই জায়েয। কিন্তু এর

মানে এই নয় যে সেই সময়ে সেই কাজ ব্যতীত আর কোন কাজ করা যাবে না অথবা তা করলে গুনাহ হবে তা নয়। আমাদের একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের নবী যে সকল কাজ করেছেন সেগুলো তো অবশ্যই জায়েয, কিন্তু এর মানে এই নয় যে সেই কাজ ব্যতীত অন্য সব কাজ নাজায়েয। বরং অন্য কাজকে ইসলামী শরীয়তের আলোকে দেখতে হবে। যদি সেটা ইসলামী শরীয়তের বিরোধী না হয় তা হলে সেটা অবশ্যই জায়েজ। যেমন মিলাদ মাহফিল করা এবং এই বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মিলাদ মাহফিলের বৈধতা প্রমাণ করা।

তাই সোমবারে যেমন রোযা রাখা সুন্নত তেমনি মিলাদ মাহফিল করা যাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না হয় তা মুস্তাহাব।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه   مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللّٰه

মহানবী নিজের আকীকা করেছেন

ঈদে মিলাদুন্নবী এর সমর্থনে আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) একটি হাদীস থেকে বলেছেন তা ইমাম বায়হাকী (রাঃ) সাহাবী হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন হযরত নবী করীম ﷺ নবুওয়াত লাভের পর নিজের জন্য একটি আকীকা করেছিলেন, অথচ তার জন্মের পর সপ্তম দিনে তার দাদা আবদুল মুত্তালিব তার আকীকা করেছিলেন। শরীয়তে দ্বিতীয়বার আকীকা করার কোন প্রচলন নেই। এখানে হযরত নবী করিম ﷺ এর দ্বিতীয়বার আকীকা দেবার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলা যে তাকে এ দুনিয়ায় রাহমাতুল লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় করা।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে শরীয়াতে আকীকার নিয়ম কেবল একবার, অথচ প্রিয়নবী নবুওয়াত লাভের পর আবার তার আকীকা করলেন। এর কারণ ছিল আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। তাই আমরা যদি শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে নবীর আগমনের খুশি প্রকাশ করি তবে তা কোন অবস্থায় বর্জনীয় হতে পারে না বরং প্রশংসনীয় এবং মুস্তাহাব।

এখানে মিলাদের বিরুদ্ধবাদীরা এই যুক্তি দাঁড় করায় যে আমাদের প্রিয়নবীর দ্বিতীয় আকীকা এজন্য করা হয় যে প্রথম আকীকা ছিল আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে। তাই নবুওয়াত লাভের পর সেই আকীকা বাতিল হয়ে যায় এবং এজন্য তিনি দ্বিতীয় বার আকীকা করেন। তাদের এই খোঁড়া যুক্তির জবাব হচ্ছে এই যে যদি ধরে নেয়া হয় যে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের দরুন নবীর

আকিকা বাতিল হয়ে গেছে এবং এটা পুনরায় করা হবে তাহলে তো প্রিয়নবীর নিকাহ ভেঙ্গে যেত (নাউযুবিল্লাহ)। যদি আইয়ামে জাহেলিয়াতের কারণে প্রিয়নবীর আকীকা ভেঙ্গে যেত তাহলে তো প্রিয়নবী এর সাথে হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকাহ ভেঙ্গে যেত। আমরা যদি নবীর জীবন পর্যবেক্ষণ করি তবে আমরা জানতে পারব যে নবুওয়াত লাভের ১৫ বছর পূর্বে আমাদের নবী হযরত খাদীজার (রাঃ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু নবী তো নবুওয়াত লাভের পর নিকাহ দ্বিতীয় বার করেন নি।

আসলে আমাদের প্রিয়নবীর মর্যাদাকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত ক্ষুণ্ন করতে পারে না। আমাদের নবীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য স্বয়ং আল্লাহ বৃদ্ধি করেছেন। তাই আইয়্যামে জাহেলিয়াত যেমন নবীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারেনি ঠিক একই ভাবে তা নবীর পবিত্র বিবাহেরও কোনরূপ ক্ষতি করতে পারেনি। এজন্য প্রিয়নবী হযরত খাদীজার সাথে দ্বিতীয়বার নিকাহ করেননি। অপর দিকে নবী করিম দ্বিতীয়বার তার আকীকা করে ছিলেন এই জন্য নয় যে প্রথমটি ভেঙ্গে গিয়েছিল বরং সেটা ছিল আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করার জন্য।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মের আনন্দ প্রকাশ করার পুরস্কার

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্মের খুশি প্রকাশ করার মাহাত্ম্য ও ফযীলত অনেক। যারা আশেকে রাসূল বান্দা তথা প্রিয়নবীকে নিজের জান ও মালের চেয়েও বেশী মুহাব্বত করে তারা মূলত একটি হাদীস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল পালন করে থাকে। এই হাদীসটি হযরত উরওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ”আবু লাহাব সুয়াইবীয়াকে মুক্ত করে, এরপর সে রাসূল কে দুধ পান করায়। অতঃপর আবু লাহাবের মৃত্যুর পর তার জনৈক আত্মীয় হযরত আব্বাস (রা) তাকে খুব খারাপ অবস্থায় সপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে? উত্তরে আবু লাহাব বলল তোমাদের থেকে চলে আসার পর অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর শান্তিতে থাকার সুযোগ আমার হয়নি, তবে এর মুহাম্মদ ﷺ এর জন্মের খুশী হয়ে আমার দাসী সুয়াইবীয়া মুক্ত করার কারণে আমি প্রতি সোমবার একটু পানি পান করে শান্তি পাই। অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করে।” (সহীহ বুখারী)

একই হাদীস সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) রচিত "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে এবং আল্লামা আইনী রচিত "উমাদাতুল কারী" গ্রন্থে হযরত সুহাইলী থেকে উল্লেখ করেছেন, সাহাবী হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তার অবস্থা খুবই খারাপ। আমি স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলাম তোমার অবস্থা কি হয়েছে? সে বলল, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমি শান্তি ও আরামের মুখ দেখিনি। কিন্তু সর্বদা প্রত্যেক সোমবার আমার শাস্তিকে কিছুটা লাঘব করা হয়। হযরত আব্বাস (রা) বলেন, এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন, আর এই বরকতময় দিনেই সুয়াইবীয়া আবু লাহাবকে হযরত নবী জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ দিয়েছিল। আর আবু লাহাব এ সংবাদে খুশী হয়ে তাকে দাসত্ব হতে মুক্ত করে ছিল।

তাছাড়া এই হাদীসের আলোকে এ সম্বন্ধে জানা যায় যে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্মের সুসংবাদ যখন আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবীয়া তার মনিব আবু লাহাবের কাছে এসে বলে তখন আবু লাহাব আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের দাসীকে শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুলের ইশারায় মুক্ত করে। প্রিয়নবী জন্মের আনন্দ প্রকাশ করার জন্য সে জাহান্নামী হওয়া সত্ত্বেও প্রতি সোমবার তার আযাব লাঘব করা হয় এবং যে দুই আঙ্গুল দ্বারা সে আযাদ করে সেই দুই আঙ্গুল দ্বারা তাকে জাহান্নামের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি পান করানো হয়।

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ, এখন আপনাদের সামনে আবু লাহাবের পরিচয় তুলে ধরছি। আবু লাহাব ছিল আমাদের প্রিয়নবীর চাচা এবং কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় সর্দার। তাছাড়া আবু লাহাব ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামের কঠোর বিরোধিতা করে এবং নবী করিম ﷺ এর নানাভাবে বিরোধিতা করে। আমাদের প্রিয়নবী যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন আবু লাহাব তার সাথে খারাপ আচরণ করে তাকে গালি গালাজ করে এবং অভিশাপ দেয়। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ প্রিয়নবীর পক্ষে জবাব দেন এবং তিনি আবু লাহাবের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন যা সূরা লাহাব নামে পরিচিত।

তাই আবু লাহাব যে সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এই আবু লাহাব প্রিয়নবীর জন্মের প্রতি খুশি হওয়ায় ও আনন্দ করায় প্রতি সোমবার আল্লাহ তার জাহান্নামের আযাব লাঘব করে দেন এবং তাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুহাদ্দিসে কেরাম এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও হাদীস বিশারদ মুফতী-এ-আযম সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল

ইহসান বারকাতী (রাঃ) বলেছেন যে এক কাফের ব্যক্তি যার উপর লানত করে আল্লাহ্ পাক কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন, সেই কাফির ব্যক্তি যখন প্রিয়নবীর জন্মের সংবাদ শুনে আনন্দিত হয়ে শুধু মাত্র একটি ভাল কাজ করার কারণে মহান আল্লাহ যখন তার আযাব জাহান্নামে লাঘব করেন, তখন আমরা যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখি ও নবীকে মনে প্রাণে মুহাব্বত করি আমরা যদি প্রিয়নবীর জন্মের খুশিতে সামান্য আনন্দ বা উৎসব পালন করি তবে এর প্রতিফল যে আল্লাহ কি দিবেন তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এ আনন্দ উল্লাস দুনিয়ার অন্যান্য আনন্দ উৎসবের মত নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ পবিত্র ভাবধারার আনন্দ। এ আনন্দ উৎসব অবশ্যই শরীয়তের নীতিমালা ও সীমারেখায় থেকে করতে হবে।

অতএব প্রিয়নবীর দুনিয়াতে আগমন হিসেবে আনন্দ খুশী উদযাপন করা নিষেধ নয় বরং জায়েজ এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সহায়ক। তাই আমরা যদি শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে ঈদে মিলাদুন্নবী তথা নবীর জন্মের আনন্দ ও খুশি পালন করি তবে রোজ কিয়ামতে নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে এর বিরাট প্রতিদান দিবেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

ঈদে মিলাদুন্নবীর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য

ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে সেই রাত যে রাতে আমাদের প্রিয় নবী দুনিয়ার বুকে রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে তাশরীফ এনেছিলেন। তাই এ রাতের মর্যাদা যেভাবে অনন্য তেমনি ঈদে মিলাদুন্নবীতে আনন্দ ও খুশি পালন করার মাহাত্ম্য এবং ফযীলত অপরিসীম।

আমাদের ইসলামী শরীয়তের ঈদ হচ্ছে দুটি একটি ঈদুল ফিতর ও আরেকটি ঈদুল আযহা। এই দুটি ঈদ হচ্ছে মুসলমানদের জন্য কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী শুধু মুসলমানদের নয় বরং সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য, তার কারণ হচ্ছে প্রিয়নবীকে শুধু মুসলমান বা শুধু আরববাসীদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতি তথা সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এ বিষয় সম্বন্ধে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(سورة سبأ ٢٨)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, তবে অনেকেই তা জানে না। (সূরা সাবা : ২৮)

অর্থ্যাৎ আমাদের নবী যেমন আমাদের জন্য অথ্যাৎ মুসলমানদের জন্য নবী তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী বা অন্যন্য ধর্মালম্বীরা যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে বা আল্লাহর সাথে শিরক করে তাদেরও নবী এবং তাদের জন্যও তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। মুসলমানদের জন্য তিনি সুসংবাদদাতা ও কাফিরদের জন্য তিনি সতর্ককারীর ন্যায়। শুধু মানুষ নয় বরং পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা, চন্দ্র-সূর্য, তথা সকল সৃষ্টির জন্য তিনি রহমতস্বরূপ। কারণ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ (سورة الأنبياء ١٠٧)

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা মুসলমানদের শরীয়তের দুটো ঈদ যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু আহকাম পালন করতে হয়। যেমন উভয় ঈদে প্রত্যেক বালেগ সুস্থ পুরুষের উপর দুই রাকাআত ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব। শুধু তাই নয় ঈদুল ফিতরের নামাযের আগে সদকায়ে ফিতর করা এবং ঈদুল আযহার নামাযের পর কোরবানী করা সামার্থবানদের উপর ওয়াজিব। এই আমলগুলো শরীয়তের বিধান যা এমন কোন সামর্থবান ও সক্ষম ব্যক্তি পালন না করে তবে নিঃসন্দেহে সে গুনাহগার হবে।

অপরদিকে ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল শরীয়তের কোন বাধ্যতামূলক অংশ নয় বা এরূপ উদযাপন করায় শরীয়তের কোন বাধ্য বাধ্যকতা নেই। কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন না করার এই অর্থ হচ্ছে যে, প্রিয়নবীর দুনিয়াতে আগমনের খুশি ও আনন্দ প্রকাশ না করা। কোন ব্যক্তি যদি ঈদে মিলাদুন্নবীর ফযীলত ও মাহাত্ম্য জানার পরও তা উদযাপন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং অন্যকেও বিরত থাকতে বলে তবে বুঝতে হবে তার অন্তরে নবীর প্রেমের ঘাটতি রয়েছে। এবং যাদের অন্তরে নবীর প্রেমের ঘাটতি আছে তারা কখনো মুমিন হতে পারে না। কারণ আমাদের প্রিয়নবী বলেছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পরাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান-সন্তানাদি এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় না হই।(সহীহ বুখারী)

সুতরাং এই হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে মুহাব্বত করে এবং সে জন্য ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে, মিলাদ মাহফিল করে তাদের বিরোধিতা করা অর্থাৎ নবীর মুহাব্বতের বিরোধিতা করা।

নবীর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা এমন একটি জিনিস যার বদৌলতেই মানুষকে জান্নাত নসীব হবে। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে নবীজি বলেছেন "মানুষ (দুনিয়ায়) যে যাকে ভালবাসে (পরকালে) সে তারই সঙ্গী হবে।" (সহীহ বুখারী)

একই বিষয় মহান আলাহ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করছেন এভাবে–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○ (سورة التوبة ٢٤)

অর্থ : বলুন, (হে নবী আপনি বলে দিন) যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় মন্দা দেখার ভয়ে তটস্থ থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর, এসব যদি আলাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে আলাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, আলাহ কখনও ফাসেকদের (সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে) সৎপথের সন্ধান দেন না। (সূরা তওবা : ২৪)

আমরা যদি দুনিয়াতে প্রিয়নবীকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে চলি তবে নিঃসন্দেহে পরকালে আমরা প্রিয়নবীর সঙ্গী হব। পরকালে যদি কোন ব্যক্তি প্রিয়নবীর সঙ্গী হতে পারে তবে তার চিন্তার কোন কারণ থাকবে না, কারণ পরকালে প্রিয়নবীর সঙ্গী হওয়া মানে আখেরাতের যাবতীয় দুঃচিন্তা তথা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত হওয়া এবং প্রিয়নবীর শাফায়াতের মাধ্যমে জান্নাতী হওয়া।

তাছাড়া মিলাদ মাহফিল বা ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে মানুষের মনে প্রিয়নবীর মুহাব্বত উৎজ্জীবিত করার উপায়। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে যেমন প্রিয়নবীর মুহাব্বত সৃষ্টি হয় একইভাবে সেখানে প্রিয়নবীর জীবনী জানার মাধ্যমে একজন মানুষ নিজের জীবনকে ইসলামের আলোকে গড়তে পারে।

এখন যারা ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল পালন করে না, সেটা তাদের নিজেদের ব্যাপার যে তারা নিজেরা নিজেদেরকে ঈদে মিলাদুন্নবীর ফযীলত হতে দূরে রাখছে। কিন্তু তারা পালন করে না এর অর্থ এই নয় যে মিলাদ বা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা হারাম বা নাজায়েয। বরং যাদের অন্তরে

ঈমান আছে তাদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা কখনই আসতে পারে না যে ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল নাজায়েয।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন বর্তমানে মুসলমানদের যে সংকটময় অবস্থা, সে জন্য আমাদের কি মিলাদ মাহফিল করা উচিত নয়। যার আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বেই তাকে পাওয়ার জন্য নিখিল ভুবন উদগ্রীব ছিল, যিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রহমত স্বরূপ, যাকে মহান আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠ প্রশংসিত রূপে উল্লেখ করেছেন, যার শাফায়াতের বরকতে অসংখ্য গুনাহগার মুক্তি লাভ করবে সেই মহান নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পাক নামে মিলাদ মাহফিল, তাঁর জন্ম ও জীবন বর্ণনা এবং তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ এ যদি কারো মতভেদ বা আপত্তি থাকে তবে বাস্তবিকই সে ব্যক্তি দুর্বল ঈমানের অধিকারী।

ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিলে প্রিয়নবীর জন্ম ও জীবনী আলোচনা এবং তার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা ছাড়া এমন কোন কাজ করা হয় না যাতে সেটিকে হারাম বা নাজায়েয বলা যায়। তাই আমাদের উচিত সব সময় মিলাদ মাহফিল করা এবং এর রহমত ও বরকত হাসিল করে আখিরাতের পথ পরিস্কার করা।

এতক্ষণ ঈদে মিলাদুন্নবীর সামান্য কিছু ফযীলত আলোচনা করা হল যা একজন মানুষ সেই রাতে আমল করে পেতে পারে। শেখ ইমাম কাস্তলানী তার কিতাব "মাওয়াহেব" এ ঈদে মিলাদুন্নবী ও লাইলাতুল কদরের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন সেখানে তিনি ঈদে মিলাদুন্নবীর তিনটি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তা হল–

এক ঃ লাইলাতুল কদর হচ্ছে কুরআনের অবতরণের রাত এবং মিলাদ রজনী বা ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে 'সাহেবে কুরআন' তথা রাহমাতুললিল আলামীন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর দুনিয়াতে আগমনের রাত।

দুই ঃ লাইলাতুল কদরের মর্যাদাময় হবার আরেকটি কারণ হচ্ছে যে সেই রাতে দুনিয়ার ফেরেশতা নাযিল হয়, অপর দিকে মিলাদ রজনী হচ্ছে সেই রাত যে রাতে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ দুনিয়াতে আগমন করেছেন।

তিন ঃ লাইলাতুল কদর এর মাধ্যমে শুধু উম্মতী মুহাম্মদীর মর্যাদা বেড়েছে, কিন্তু মিলাদ রজনীতে প্রিয়নবীর আগমনের মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টির মর্যাদা বেড়েছে, কারণ তিনি এসেছেন সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রহমত হিসেবে।

এখানে শেখ ইমাম কাস্তালনী ঈদে মিলাদুন্নবীর রাতের এমন সময় তিনটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন যা লাইলাতুল কদর থেকে আলাদা। কিন্তু এর মানে এই নয় মিলাদ রজনীর মর্যাদা লাইলাতুল কদরের চেয়ে বেশী। বরং .আমরা

সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করি যে লাইলাতুল কদর হচ্ছে সর্বোত্তম রজনী। কারণ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ (سورة القدر۳)

অর্থ ঃ এই রাত লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।(সূরা আল কদর-৩)

আমাদের প্রিয়নবীকে মহান আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেরাদের সেরা করে, শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করে। আমাদের প্রিয় নবীর দুনিয়াতে আগমন সম্বন্ধে একটি হাদীস আছে । হযরত নবী করিম ﷺ বলেছেন "আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ) কে সম্মানিত করেছেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে বনী কিনানাকে সম্মানিত করেছেন। বনী কিনানার সন্তানদের মধ্যে কুরাইশদের সম্মানিত করেছেন। কুরাইশদের সন্তানদের মধ্যে হাশেমী বংশকে সম্মানিত করেছেন। আর হাশেমী বংশের মধ্যে আমাকে করেছেন সম্মানিত।" (সহীহ মুসলিম)

আমাদের কেবল একটি বার চিন্তা করা উচিত যে নবীকে পেতে দিন ও রাত ব্যাকুল থেকেছে, যে নবীর উম্মত হবার আকাঙ্ক্ষা অন্য নবীরা করেছেন আর আমরা আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে সেই নবীর উম্মতী হয়েছি। তাই মহান আল্লাহর এই বিরাট অনুগ্রহ তথা রহমতের জন্য আমাদের ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা উচিত যাতে আমাদের অন্তরে নবী প্রেম জাগ্রত হয় এবং আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারি।

رَبِّ سَلِّمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللهِ

ঈদে মিলাদুন্নবী
মুসলমানদের একতার মাধ্যম, বিভাজনের নয়

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন এই দুনিয়াতে জন্মলাভ করেন, তখন সমস্ত কুল মাখলুক প্রিয়নবীর আগমনের আনন্দে ভাসছিল। জান্নাতী হুরও পুণ্যময় মহিলারা আগমন করেছিলেন হযরত মা আমেনা এর প্রসবকালীন অবস্থায় তাঁকে সাহায্য করার জন্য। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্মের পর তাঁর দাদা-চাচাসহ সমগ্র মক্কাবাসী যারপরনাই খুশি হয়েছিল। এমনকি কাফিরদের সর্দার আবু লাহাব সেও আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু শুধু একজন নারাজ হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল, আফসোস ও মাতম করেছিল এবং সে হচ্ছে অভিশপ্ত শয়তান ইবলিস। কারণ সে জানে এই নবীকে বা তাঁর উম্মতীদের বিভ্রান্ত করা এত সহজ নয়।

এই জন্য তো বিশ্বনবীর ওফাতের ১৪০০ বছর পরও সারা দুনিয়ার মানুষ ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল উদযাপিত করে সেই সময়কার আনন্দ ও খুশির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। আর আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ বা মিলাদ মাহফিল হলেই নারাজ, বেজার হয়ে যায়, কোনো অজানা কারণে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, বর্তমান বিশ্বে একমাত্র প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণই পারে সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে। ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল নিয়ে এখন যে বিরোধ দেখা যায় এটা তো কয়েক বছর আগে ছিলই না। এমনকি ১৯২০ এর পরবর্তী সময় আল-সউদ পরিবারের হেজাজ বর্তমান সউদী আরবের ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত যারা যারা হিজাজ (বর্তমান সউদী আরব) শাসন করেছে উসমানী, আব্বাসীয় বা ফাতেমী বংশধরেরা তাঁদের প্রত্যেকের যুগে মিলাদ ও কিয়াম হয়েছে মক্কা মদীনায়। যতদিন মিলাদ মাহফিল এই সকল অঞ্চলে পালিত হয়েছে ততদিন তারা ছিল এক। কিন্তু যখন থেকে হিজাজের শাসকেরা মিলাদ মাহফিলের বিরোধিতা শুরু করলো, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদই বেড়েছে, ঐক্য আসেছি।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সমস্ত মুসলমানদের আল্লাহর বান্দা ও প্রিয় নবীর উম্মতী হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকা। তাই এই জন্য নিজেদের মধে ছোটখাটো ভেদাভেদ ভুলে যাওয়াই উত্তম। যেমন ঈদে মিলাদুন্নবী সম্পর্কে আমরা কখনোই বলি না, এটা অবশ্যই করতে হবে বা এটা করা ফরজ এমন নয়। বরং সম্মানের দৃষ্টিতে আদবের জন্যই আমরা করে থাকি। যেমন–

- যদি কারুর মিলাদুন্নবী কথার সাথে আপত্তি থাকে তাহলে সীরাতুন্নবী হিসেবে পালন করুন। কিন্তু প্রিয় নবীর জীবনচর্চা হতে বিরত থাকবেন না।
- যদি দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম থাকে তবে বসে পড়ুন। আমরা যারা দাঁড়িয়ে পড়ি তারা অধিক আদবের খাতিরেই পড়ি। তাই দাঁড়িয়ে পড়া যাবে না, এই অজুহাতে দরূদ শরীফ পড়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না।
- যদি ১২ রবিউল আউয়াল বা কোনো নির্দিষ্ট দিনে করা নিয়ে আপত্তি থাকে তাহলে বছরের অন্য যে কোনো দিন করুন, আমরা তো কখনই বলছি না যে এটা ১২ রবিউল আউয়ালই হতে হবে। কিন্তু এই খোঁড়া অজুহাতে নিজেকে প্রিয়নবীর আলোচনা হতে মাহরুম করবেন না।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আমাদের এই কিতাব রচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরে ইশকে রাসূল, আদাবে রাসূল, আহকামে রাসূলকে তাজা করা। এইজন্য ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে অত্যন্ত উপযোগী একটি মাধ্যম। এই মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান মাহফিলের বৈধতা কোরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

তৃতীয় অধ্যায়

মিলাদ মাহফিল

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

মিলাদ মাহফিল হচ্ছে এমন এক পূন্যময় আয়োজনের নাম যেখানে কিছু সংখ্যক মুসলমান বান্দারা একত্রিত হয়ে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, হামদ–বারী তাআলা; নাতে রাসূল পেশ করা তাওয়াললুদ শরীফ পাঠ করা এবং তারপর বসে ও দাঁড়িয়ে কিয়াম ও কাসীদার মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা হয়। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত ও দোআ করা হয়। কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে মিলাদ মাহফিল এর সার্থকতা ও যর্থাথতা তুলে ধরা হবে।

কুরআনের বাণী

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। তাদের জন্য যারা আল্লাহর নৈকট্য ও কিয়ামত দিবসের (কল্যাণময়) উপস্থিতির আকাঙ্ক্ষা রাখে।

হাদীসের আলো

طُوْبٰى لِمَنْ رَآنِيْ وَطُوْبٰى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَانِيْ بَلْ اٰمَنَ بِيْ

ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে আমাকে(মহানবীকে) দেখেছে এবং ঐ ব্যক্তি তার চেয়েও সাতগুন বেশী সৌভাগ্যবান যে আমাকে দেখেনি তবুও পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমার প্রতি ঈমান এনেছে।

শানে মুস্তাফা ﷺ

چھوٹ جائیں اگر دامنِ کونین تو غم کیا
لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامنِ محمد ﷺ

ছুটে যাক দোজাহানের সম্পদ তবুও নেই কোন আফসোস
কিন্তু না ছুটুক আমার সাথে মুহাম্মদ ﷺ-এর সান্নিধ্য

بسم الله الرحمن الرحيم

মিলাদ মাহফিল বা মিলাদুন্নবী হচ্ছে এমন একটি বরকতময় অনুষ্ঠান যেখানে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, হামদে বারী তাআলা ও নাতে রাসূল পেশ করা হয়, নবীর জন্ম ও জীবন থেকে কিছু শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখা হয়, বসে এবং দাঁড়িয়ে (কিয়াম) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা হয় এবং সর্বশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দোআ করা হয়। এ সকল পুণ্যময় আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীর জন্মের খুশি ও আনন্দ প্রকাশ ও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে সব জায়গায় সারা বছরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলাদ মাহফিল পালন করা হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি উত্তম কাজ।

মিলাদ মাহফিল

মিলাদ মাহফিল বলতে শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থে জন্মের অনুষ্ঠান বলা হলেও আমাদের দেশে মানুষের প্রবণতা হচ্ছে যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে মিলাদ মাহফিল বলা। এটি পুরোপুরি শুদ্ধ না হলেও এরূপ বলায় কোন দোষ নেই।

আমরা বিদেশী বিশেষ করে উর্দু, ফার্সী শব্দের সাথে এত অধিক অভ্যস্ত যে মূল শব্দের চেয়ে সেগুলোই বেশী ব্যবহার করি। যেমন অনেক ব্যক্তি সালাত, সিয়ামকে নামায, রোযা নামেই চিনে। অথচ নামায, রোযা উভয়ই ফার্সী শব্দ এবং কুরআন ও হাদীসে কোথাও এরূপ শব্দের প্রয়োগ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই সালাতকে নামায, সিয়ামকে, রোযা নামেই চিনে। তবে এরূপ বলাতে কোন দোষ নেই বরং জায়েজ ও বৈধ। কারণ আমরা সালাতকেই নামায, সিয়ামকেই রোযা বলি, অন্য কিছুকে নয়। একইভাবে যে সকল মজলিশে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা হয় সেটা মূলত দরূদ ও সালাম এর মাহফিল হলেও মানুষ তাকে মিলাদ মাহফিল বলতেই অভ্যস্ত। এই সকল মজলিশে আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতের অর্থাৎ প্রিয়নবী হযরত

মুহাম্মদ ﷺ এর দুনিয়াতে আগমন তথা তাঁর উম্মতী হওয়ার সৌভাগ্য লাভের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা হয় ও নিজকে মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে পেশ করা হয়।

মিলাদ মাহফিলের উদ্দেশ্য

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى – (متقف عليه)

অর্থ : নিশ্চয়ই যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যা সে নিয়ত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

এটি বুখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীস যেখানে আল্লাহর প্রিয়নবী বলেছেন যে কাজের ফলাফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তাই আমরা যে মিলাদ মাহফিল করি তা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা সামাজিক সম্মান লাভের আশায় করা উচিত নয়। বরং মিলাদ মাহফিল আমাদেরকে করা উচিত যাতে প্রিয় নবীর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি সালাম পেশ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং সমাজের সর্বস্তরে প্রিয়নবী এর চারিত্রিক আদর্শ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়। কেউ যদি দুনিয়াবী ফায়দার জন্য এগুলো করে তবে সে তাই অর্জন করবে। মিলাদ মাহফিলের ফায়দা, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য থেকে সে বঞ্চিত হবে।

দোয়া কবুল হবার শর্ত হচ্ছে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা, তাই এ সকল মজলিশে বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পেশ করা হয়। এবং এ সকল মজলিসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয়নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মিলাদ মাহফিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাওলানা নাকী আলী খান (রহ.)। "মিলাদ মাহফিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করবে প্রিয়নবীর জন্ম ও তাঁর উম্মতী হবার জন্য। শুধু তাই নয়, প্রিয়নবীর অনুপম চরিত্র আলোচনা, তাঁর প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালাম পেশ, মিষ্টি ও তাবারুক বিতরণ করবে এবং যাবতীয় বৈধরূপে শরীয়তসম্মত উপায়ে সর্বোচ্চরূপে এই খুশী পালন করবে।"

মিলাদ মাহফিলের বিষয়বস্তু

সাধারণত একটি মিলাদ মাহফিলের মজলিশে নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজ বা আমলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

- পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, তরজমা ও তাফসীর।
- হামদ-এ-বারী তা'আলা (মহান আল্লাহর প্রশংসা ছন্দময় কবিতার মাধ্যমে)
- নাতে রাসূল (মহানবীর প্রশংসা ছন্দময় কবিতার মাধ্যমে)
- প্রিয়নবীর জীবনী তথা সীরাত আলোচনা।
- প্রিয়নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা (বসে ও দাঁড়িয়ে)
- দোয়া
- মিষ্টি ও তাবারুক বিতরণ করা।

এখানে উল্লেখিত এই কাজ, আমল বা বিষয়গুলোই সাধারনত মিলাদ মাহফিলে হয়ে থাকে। এখন এই প্রত্যেকটি বিষয়গুলার বিশ্লেষণ করা হবে কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের আলোকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি প্রমাণ করা যে কোন অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিষয় যদি কুরআন এবং হাদীসের আলোকে সমর্থিত হয় তবে সেই অনুষ্ঠানটিও শরীয়ত সম্মত হবে।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, তরজমা ও তাফসীর

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, তরজমা ও তাফসীর এই বিষয়গুলো যে শরীয়ত সম্মত এতে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

হামদ-এ-বারী তাআলা

হামদ-এ-বারী তাআলা হচ্ছে এমন একটি আমল যেখানে ছন্দময় কবিতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। একজন মুসলমান উঠতে, বসতে, চলতে, হাঁটতে তার দৈনন্দিন জীবনে সর্বদাই আল্লাহর প্রশংসা করে। শুধু মানুষ নয় সমস্ত সৃষ্টিকুলই আল্লাহর প্রশংসা করে।

আল্লাহ এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে বলেন,

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ (سورة الصف ١)

অর্থ ঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাবান (সূরা আছ ছাফ-১)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ পাক নিজেই নিজের ঘোষণা দিচ্ছেন যে, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর প্রশংসায় মশগুল রয়েছে। তাই হামদ-এ-বারী তাআলা যে শরীয়ত সম্মত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, বরং এই কাজের দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য অর্জন করা যায়।

নাতে রাসূল

নাতে রাসূল হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসা করা হয় সুন্দর কণ্ঠে কবিতার ছন্দে। এই বিষয়টি যে শরীয়ত সম্মত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় যে বর্তমান যুগে কিছু মুসলমান! নামধারী ব্যক্তিরা এই পবিত্র বিষয়টির বিরোধিতা করে।

এখন দেখা যাক যার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন নাযিল করেছেন, যে কুরআনকে আল্লাহ নবীর বক্ষে পৌঁছে দিয়েছেন সেই কুরআন এর জবাব কি ভাবে দেয়।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○ (أَلَمْ نَشْرَحْ ٤)

অর্থ ঃ "আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতিকে সুউচ্চ করেছি।" (সূরা আল-ইনশিরাহ-৪)

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ○ (سورة الأحزاب ٥٦)

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম, (রহমত) বর্ষণ করছেন, অতএব হে ঈমানদার বান্দাগণ, তোমরাও তার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ কর।" (সূরা আল-আহযাব-৫৬)

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ○ (سورة الأنبياء ١٠٧)

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(سورة سبأ ٢٨)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, , তবে অনেকেই তা জানে না। (সূরা সাবা : ২৮)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ (سورة الأنفال ١٧)

অর্থ ঃ আর আপনি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করেন নি, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছিলেন যেন ইমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত । (সূরা আল আনফাল-১৭)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ○ (سورة الأحزاب ٤٥)

অর্থ ঃ হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপেএবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আল-আহযাব-৪৫)

اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ○ (سورة الأحزاب ٦)

অর্থ ঃ "নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।" (সূরা আল আহযাব-৬)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ○ (سورة الأحزاب ٢١)

অর্থ ঃ যারা আল্লাহতায়ালা ও শেষ দিবসে আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ এর মধ্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আল আহযাব-২১)

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ○ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ○ (سورة النساء ٨٠-٨١)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে বিশ্ব মানবতার জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি আর এ বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে আমি আল্লাহই যথেষ্ট যে ব্যক্তি রাসূলকে অনুসরণ করল সে তো আল্লাহ তায়ালারই অনুসরণ করল। (সূরা আন-নিসা ঃ ৭৯-৮০)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ (سورة الأنفال ٦٤)

অর্থ ঃ হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনাকে অনুসরণ করে তাদের সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আনফাল, ৬৪)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

(سورة الجمعة ٢)

অর্থ ঃ তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত, ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

–(সূরা আল জুমুআহ : ২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○

(سورة الحجرات ٢)

অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচু করে না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিঃস্বফল হয়ে যাবে এবং তোমরা তা বুঝতেও পারবে না।" (সূরা আল-হুজরাত:২)

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ○ (سورة الحشر-٧)

অর্থ ঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর ও যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।" (সূরা আল-হাশর-৭)

মহান আল্লাহ্ প্রিয় নবীকে তাঁর নাম ধরে কখনোও সম্বোধন করেননি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান মর্যাদা ও সম্মানের আরেকটি দিক হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা কোন সময় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করেননি। আল্লাহ তাআলা সব সময় তাঁকে নবী, রাসূল বা সম্মানজনক অন্য কোন উপাধি দ্বারা আহবান করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ○ (سورة المائدة ٦٧)

অর্থ ঃ হে রাসূল! যারা কুফরীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তাদের কর্ম আপনাকে যেন বেদনাহত না করে। (সূরা আল মায়েদা, ৪১)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ○ (سورة المائدة ٦٧)

অর্থ ঃ হে রাসূল! যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন। (সূরা আল মায়েদা, ৬৭)

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ (سورة الأنفال ٦٤)

অর্থ ঃ হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনাকে অনুসরণ করে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (সূরা আনফাল, ৬৪)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَ قَلِيْلاً ○ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً ○ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ○ (سورة المزمل: ١-٤)

অর্থ ঃ হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল) ব্যক্তি। রাতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধরাত্রি বা তার চেয়ে কিছু কম, অথবা তার চেয়ে বেশী। এবং কুরআন তেলাওয়াত করুন সুবিন্যাস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (সূরা মুয্যাম্মিল, ১-৪)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَأَنْذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○ (سورة المدثر: ١-٣)

অর্থ ঃ হে চাদরাবৃত (রাসূল) ব্যক্তি। উঠুন, সর্তক করুন। আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। (সূরা আল মুদ্দাসিসর, ১-৩)

এমনিভাবে আরও বহু আয়াত রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য নবীগণের ক্ষেত্রে নাম ধরে আহবান করেন ঃ

আল্লাহ তাআলা আদম (আ) কে আহবান করেছেন-

يَا اٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ○ (سورة البقرة ٣٤)

অর্থ ঃ হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর। (সূরা আল বাকারা, ৩৫)

আল্লাহ পাক নূহ্ (আ)-কে আহবান করেছেন-

يَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا ○ (سورة هود ٤٨)

অর্থ ঃ হে নূহ! অবতরণ কর আমাদের নিরাপত্তাধীনে। (সূরা হুদ, ৪৮)

তিনি ইবরাহীম (আ)-কে আহবান করেছেন-

يَآ اِبْرٰهِيْمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ○ (سُوْرَةُ الصّٰفّٰت ۱۰۴-۱۰۵)

অর্থ ঃ হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছো।

(সূরা আস সাফফাত, ১০৪-১০৫)

তিনি মূসা (আ)-কে আহবান করেছেন–

يَا مُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○(سورة القصص ٣٠)

অর্থ ঃ হে মূসা! নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ সারা জাহানের পালনকর্তা।

(সূরা আল কাসাস, ৩০)

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ)-কে বলেছেন–

يَا عِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا○

(سورة آل عمران ٦٨)

অর্থ ঃ হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেব এবং তোমাকে আমার নিকট তুলে নেব, কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেব। (সূরা আলে ইমরান, ৫৫)

এভাবে মহান আল্লাহ শুধু আমাদের নবীকে নয়, বরং তার পবিত্র নামকেও সম্মানিত করেছেন।

কিবলা পরিবর্তন হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর ইচ্ছার প্রেক্ষিতে

ইসলামের প্রথম ও বর্তমান কেবলা পবিত্র কাবা শরীফ। তবে হিজরতের পর ১৬-১৭ মাস সময়ের জন্য কাবা শরীফের স্থলে হযরত সোলায়মান (আ.) কর্তৃক নির্মিত বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের কিবলা নির্ধারণ করা হয়। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ প্রায়ই কামনা করতেন যেন মহান আল্লাহ পাক পুনরায় কাবা শরীফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারণ করে দেন। এইজন্য প্রিয়নবী ﷺ প্রায়শই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন ওহী আগমনের অপেক্ষায়। পরিশেষে আলিমুল গায়েব মহান আল্লাহ পাক নাযিল করেন কোরআনের এই আয়াত–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

(سورة البقرة ١٤٤)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যা আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন; এবং তোমরা যেখানেই থাক সেদিকে মুখ কর; যারা আহলে কিতাব, তারা অবশ্যই জানে, এটাই ঠিক তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ বেখবর নন সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। –(সূরা বাকারা : ১৪৪)

সুবহানাল্লাহ! এখানে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন, আপনি সেই কেবলার দিকে মুখ করেন যেটা আপনি পছন্দ করেন। এরপর থেকেই কাবা শরীফ মুসলমানদের জন্য কেবলা নির্ধারিত হয়।

যে সময়ে এই আয়াত নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বনু সালমার মসজিদে যোহর কিংবা আসরের নামাযে ইমামতি করছিলেন। নামাযরত অবস্থায় ২য় রাকাতে ওহী নাযিল হয়। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ উত্তর দিক থেকে উঠে দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন।[১] অর্থাৎ প্রথম কাতার থেকে উঠে একদম পিছনের কাতারে গিয়ে বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, সাহাবায়ে কেরামগণও তাঁদের মুখ ঘুরিয়ে কেবলা পরিবর্তন করলেন। তখন থেকে কাবা শরীফ মুসলমানদের চূড়ান্ত কেবলারূপে নির্ধারিত হয়। যে মসজিদে এই পুরো ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেটি এখন বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত মসজিদে যুলকিবলাতাইন (দুই কিবলার মসজিদ) নামে।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

মহান আল্লাহ নবী (আ)-গণের নাম উল্লেখ করার সময় তাদের মধ্যে প্রথমেই প্রিয় নবীর নাম উল্লেখ করেছেন

আল্লাহ তাআলার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান মর্যাদার আরেকটি বিশেষ নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণের নিকট থেকে ওয়াদা গ্রহণের সময় এবং ওহীর বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্যান্য নবীর নাম উল্লেখের পূর্বে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ ﷺ এর নাম উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি অন্যান্য নবীর শেষে প্রেরিত হয়েছেন। এ অগ্রগণ্যতা, সম্মান ও পদমর্যাদা মহান আল্লাহর নিকট জ্ঞানের প্রাধ্যান্যের ভিত্তিতেই প্রদান করা হয়েছে।

---

[১] যেহেতু কাবা শরীফ মদীনার দক্ষিণ দিকে আর বায়তুল মুকাদ্দাস উত্তর দিকে তাই নবীজী উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী তথা কাবামুখী হলেন।

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ○(سورة الأحزاب ٧)

অর্থ ঃ আর যখন আমরা নবীদের নিকট হতে মযবুত ওয়াদা গ্রহণ করলাম, আর আপনার (মুহাম্মদ নিকট হতে এবং নূহ্ (আ) ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) হতে ওয়াদা গ্রহণ করলাম, আমরা তাদের নিকট হতে অত্যন্ত দৃঢ় ওয়াদা নিয়েছি। (সূরা আল আহযাব, ৭)

অনরূপভাবে আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন–

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ○ (سورة النساء ١٦٣)

অর্থ ঃ নিশ্চতভাবে আমি আপনার (মুহাম্মদ প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি, যেমনভাবে আমি নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের উপর ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর আমি ওহী প্রেরণ করেছি, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, এবং আসবাত-এর উপর এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের উপর, আর দাউদকে আমি যবূর কিতাব প্রদান করেছি। (সূরা আন নিসা, ১৬৩)

এসব আম্বিয়া (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পূর্বের যুগের। আর তিনি হলেন মহান আল্লাহর রাসূলগণের সমাপ্তকারী শেষ নবী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদা যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকেন। এবং আল্লাহ তার এই বিশেষ রহমত ও বরকতের মাধ্যমে সুমহান সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন উনি সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রাহমাতুললিল আলামীন হুযুর হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ। এভাবে আল্লাহ আমাদের নবীকে সকল নবীর উপর মাহাত্ম্য দিয়েছেন এবং তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছেন। এজন্য আমাদের নবীর আরেকটি উপাধি হচ্ছে "ইমামুল আম্বিয়া" অর্থ্যাৎ সকল নবীদের সর্দার বা নেতা।

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা, পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে রকম প্রশংসা ও সম্মান সূচক বক্তব্য রয়েছে তার সামান্য কয়েকটিই এখানে তুলে ধরা হল। পবিত্র কুরআন তার প্রশংসায় শুধু ভরপুর নয়, তার ইজ্জত ও আযমত, শান ও শওকত এর মহিমামণ্ডিত কথাও ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখিত আয়াতসমূহ তার সামান্য নজীর মাত্র। এওয়ং আল্লাহ যার প্রশংসা বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নরূপে করেছেন তাঁর উপযুক্ত প্রশংসা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র নাম মুহাম্মদ ﷺ এর অর্থই হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রশংসিত, এবং আমাদের নবীর নামও রাখা হয়েছিল গায়েবী নির্দেশক্রমে। অতএব প্রিয় নবীর প্রশংসা বর্ণনা করা সুন্নতে এলাহীর মধ্যে গণ্য। স্বয়ং আল্লাহ যে কাজ করেন এবং যা ভালবাসেন, আদব ও তাযীমের সাথে বান্দা সেই কাজ করতে ব্রতী হলে তার চেয়ে উত্তম আমল আর কি হতে পারে।

পবিত্র কুরআন শরীফে প্রিয়নবীর সম্মান ও প্রশংসার এত সব আয়াতের পরও কিছু সংখ্যক লোক নাতে রাসূল এর বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি হচ্ছে এই যে প্রশংসার যোগ্য কেবল আল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রশংসা করা যাবে না। এবং এজন্য তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসা করাকে কুফর, বিদআত এমনকি শিরক পর্যন্ত বলে তাকে। (নাউযুবিল্লাহ)

আমি এই কথার সমর্থন করি যে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং কেবল আল্লাহই সমস্ত প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু শরীয়তের পরিসীমার মধ্যে থেকে আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির প্রশংসা করা মূলত আল্লাহর প্রশংসা করারই নামান্তর উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি যদি কোন সুন্দর বিল্ডিং বা ভবনের প্রশংসা করে সে কিন্তু ভবনের প্রশংসার পাশাপাশি পরোক্ষভাবে সেই ভবন নির্মানের কারিগর, ঠিকাদার, প্রকৌশলী এদের ও প্রশংসা করে। ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যখন প্রিয়নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসা করি তার শানে নাতে রাসূল সুললিত কণ্ঠে পেশ করা হয় তখন আমরা যেমন প্রিয়নবীর প্রশংসা করছি, ঠিক একই ভাবে তাঁর ও আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার ও প্রশংসা করছি।

এত সব কিছুর পরও মাহফিলে মিলাদের বিরুদ্ধবাদীরা নাতে রাসূলের বিরোধিতা করে এভাবে যে আল্লাহর প্রশংসা হওয়া উচিত এক রকম ও নবীর প্রশংসা হওয়া উচিত একটি সীমার মধ্যে সীমিত। তাদের এই ধারণার জবাব আল্লাহ কুরআন এভাবে দিয়েছেন-

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○ (سورة النشرح ٤)

অর্থ ঃ আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতিকে সুউচ্চ করেছি। (সূরা ইনশিরাহ-৪)

এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবীর হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসাকে বুলন্দ করে দিয়েছেন। কত বুলন্দ করেছেন বা সম্মানিত করেছেন তাঁর কোন সীমারেখা আল্লাহ রাখেননি। যখন আল্লাহ পাকই নবীর মর্যাদা ও সম্মানের কোন সীমা রাখলেন না তখন আমাদের কি সাধ্য যে আমরা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসা একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ করি। তবে নাতে

রাসূল পরিবেশন করার সময় আমাদেরকে দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

এক ঃ প্রিয়নবীর মর্যাদা যা দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো বাক্য, শব্দ বা কাজ দ্বারা নবীর প্রশংসা করা যাবে না।

দুই ঃ কোন অবস্থাতেই প্রিয়নবীকে আল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করা যাবে না, কারণ সেটা শিরকের পর্যায় চলে যায়।

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আমি মনে করি এতসব আলোচনার পর কোন মুসলমানের মনে নাতে রাসূলের বৈধতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। এখন হাদীসের আলোকে নাতে রাসূল এর আলোচনা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা হবে। পূর্বের আলোচনা ছিল নাতে রাসূল এর বৈধতা প্রমাণের জন্য আর এখন কার আলোচনার কেন্দ্র হচ্ছে নাতে রাসূলের ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা।

নাতে রাসূল কোন নতুন বিষয় নয় বরং এটি হুযুর হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগ থেকে চলে আসছে। সাহাবায়ে কেরাম নিজে প্রিয়নবীর সামনে নাত রাসূল পেশ করেছেন। এরকম কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত আসওয়াদ বিন সারী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওহয়া (রাঃ), হযরত আব্বাস বিন মুত্তালিব (রঃ), হযরত কাব বিন মালেক আনসারী (রাঃ) ইত্যাদি সাহাবায়ে কেরাম নবীর সামনে নাতে রাসূল পেশ করেছেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللّٰه

নাতে রাসূল পেশকারীর জন্য আলাদা মিম্বার দেয়া

হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রা.) এর নাতে রাসূল পরিবেশনের ঘটনা একাধিক হাদীসের বইতে এসেছে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামে কাফেরদের দুর্নাম রটানোর জবাব দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে হযরত হাস্‌সান (রা.)-এর জন্য একটি মিম্বর রাখলেন। সে ঐ মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে হযরত মুহাম্মুদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পক্ষে ছন্দময় কাব্য বর্ণনা করতেন অথবা কাফেরদের মিথ্যা দুর্নাম রটানোর জবাব দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন হাস্‌সান যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের মিথ্যাচার ও দুর্নাম রটনার জবাব দিতে থাকে অথবা ইসলামের গৌরব বর্ণনা করতে থাকে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম দ্বারা তাকে সাহায্য করতে থাকেন।" (সহীহ বুখারী)।

তাছাড়া আল্লাহর রাসূল হযরত হাসসানকে (র) আরো বলেছেন "ইসলামের শত্রু (কাফেরদের) নিন্দা করে কবিতা রচনা কর, জিব্রাঈল (আ) তোমার সাহায্যের জন্য আছেন।" (সহীহ বুখারী)

অনেক তাফসীরকারী ও মুহাদ্দিসেরা এটাও বলেছেন যে ব্যক্তি নবীর শানে পূর্ণ মুহাব্বত ও আদব সহকারে নাতে রাসূল পেশ করে তাকেও মহান আল্লাহ ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُولِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُولَ اللهِ

প্রিয়নবীর সামনে নাতে রাসূল পেশ করা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন পুরো মদীনায় একটি উৎসবের আমেজ চলছিল। মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই পথে ঘাটে, বাড়ীর ছাদে সমাবেত হয়েছিল প্রিয়নবীকে এক নজর দেখার জন্য। সে দিন সম্বন্ধে হযরত ইমাম বুখারী (র) হযরত বারা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, "আমি মদীনাবাসীদেরকে কখনো প্রিয়নবী ﷺ এর আগমনের চেয়ে বেশী খুশি হতে দেখিনি।" তারা নবীর আগমনকে কেন্দ্র করে আনন্দ ও উল্লাস করছিল এবং ছোট ছোট শিশুরা 'দাফ' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নবীর আগমনের খুশি প্রকাশ করছিল।

তখন মদীনার সকলেই, নারী থেকে পুরুষ, বড় থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চাদের কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝংকারিত হয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল এ ছন্দ মালার কাসিদা দ্বারা -

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا   مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا   مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا   جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

جِئْتَ شَرَّفْتَ الْمَدِيْنَةَ   مَرْحَبًا يَا خَيْرَ دَاعٍ

সানিয়াতুল বিদার পূর্বাঞ্চলে   পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছে

তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সকলে   আল্লাহর পথে ডাকছেন তিনি

আমাদের কাছে প্রেরিত হয়ে এনেছেন আল্লাহর বিধান
পালন করার জন্য মানব সকলে
আপনি সম্মানিত করেছেন মদীনাকে
আপনাকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম! হে উত্তম দা'য়ী।

শারাফুল মুস্তাফা বইতে উল্লেখ আছে যখন নবীর উট হযরত আইয়ুব আনসারীর (র) দরজার সামনে বসে পড়ে তখন বনি নাজ্জার গোত্রের বালিকারা নিম্নের কবিতা গেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানায়

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ
يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

আমরা বনি নাজ্জারের বালিকা,
কি আনন্দ মুহাম্মদ হবেন আমাদের প্রতিবেশী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন তোমরা কি আমাকে ভালবাস। তারা জবাব দিল 'হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ' তখন তিনি বলেন আল্লাহর কসম আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি বসে বসে চরকায় সুতা কাটাছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা সেলাই করছিলেন। তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর ললাট ঘর্মাক্ত হয়েছে এবং তা থেকে নূর সৃষ্টি হয়ে ঝলমল করছে। এ অবস্থা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। হযরত নবী করীম ﷺ আমাকে হতভম্ব অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, (হে আয়েশা!) হতভম্ব হয়ে পড়েছে কেন? আমি বললাম (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনার ললাট ঘর্মাক্ত হয়েছে এবং তা থেকে নূর চমকাচ্ছে এ অবস্থায় যদি আপনাকে কবি আবু কবীর হাযালী দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বুঝতেন যে, আপনি হচ্ছেন তার কবিতার মূর্তিমান প্রতীক। তার কবিতায় ঝংকারিত হয়েছে এই ছন্দমালা ঃ

তুমি মুক্ত পবিত্র সর্ব প্রকার
অপবিত্রতা ও দোষ থেকে (সংক্ষেপিত)

কবিতার এ পংক্তিগুলো শোনার সাথে সাথে হযরত নবী করীম ﷺ তাঁর হাতের কাজ রেখে দিলেন। আর আমার কাছে এসে আমার ললাটে চুম্বন দিয়ে আমাকে বললেন। হে আয়েশা! তোমাকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন। আমার মনে পড়ে না যে, আজকের মত আমি কখনো আনন্দিত হয়েছি।" (ইবনে ও আবু নাঈম শরীফ)

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللّٰه

প্রিয়নবীর অনুমতি নিয়ে নাতে রাসূল পেশ করা

হযরত খুরাইম ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি যখন হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন তিনি তাবুক যুদ্ধ শেষ করে ফিরে আসছিলেন মাত্র। তখন আমি হযরত আব্বাস (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে আবেদন করতে শুনলাম যে, আমার মন চায় আপনার প্রশংসায় কিছু ﷺ কবিতা ছন্দাকারে আবৃত করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আচ্ছা বল, আল্লাহ তাআলা তোমার মুখকে সর্বপ্রকার আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। তখন তিনি এই কবিতাটি ছন্দাকারে আবৃত করেন–

জন্মের পূর্বে তুমি ছিলে পবিত্র জান্নাতে
সবুজ তরুলতার ছায়ায়, (সংক্ষেপিত) (হাকেম, তাবরানী শরীফ)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ এখানে আলোচ্য কয়েকটি হাদীসের মধ্যে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের নবী করিম ﷺ নাতে রাসূল পড়াকে কত পছন্দ করতেন। হযরত হাসসান (রাঃ) এর জন্য পৃথক মিম্বার তৈরী করা এটিই প্রমাণ করে প্রিয়নবী নাত পরিবেশন কারীকে কিরূপ মুহাব্বত করতেন। শুধু তাই নয় হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন নবীর কাছে তার সম্মানে নাত পেশ করার আবেদন জানান তখন প্রিয়নবী শুরুতেই তার মুখের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোআ করেন। কারণ তার মুখ দিয়ে যে পবিত্র বাক্যগুলো বের হবে তা শুধু নবীর প্রশংসা করবে এমন নয় বরং প্রিয়নবীর প্রশংসার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ও প্রশংসা করা হবে।

তাই আমাদের উচিত প্রতিটি মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে পূর্ণ আদব ও মুহাব্বতের সাথে নাতে রাসূল পড়া। কারণ এই নাতে রাসূল পড়াকে যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজে পছন্দ করেছেন এবং নাত পরিবেশনকারীকেও মুহাব্বত করেছেন তেমনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোআ করেছেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللّٰه

বিশ্বনবীর শানে কবিতা রচনা

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে কাব্যচর্চা ও কবিতার মাধ্যমে মানুষ তাঁর মনের সুপ্ত অভিব্যক্তি সমূহ প্রকাশ করে থাকে। এই জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকেরা নানা বিষয় কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু যারা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে কাব্য রচনা ও নাতে রাসূল পরিবেশন করেছেন তাঁরাই খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছেন।

আসল বিষয় হলো, এই দুনিয়াতে মুসলমানদের মধ্যে যারা যারা বিশ্বকবি হয়েছেন তাঁরা এই অবস্থানে আসতে পেরেছেন কারণ তাঁরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানে নাতে রাসূল রচনা করেছেন এবং তা সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। এরকম কয়েকজন বিশ্বকবির কথা ও তাদের কিছু কবিতা এখানে তুলে ধরা হলো।

হযরত শেখ আবু আব্দুল্লাহ শরফুদ্দীন বুশাইরী (রহ.)

মুসলিম জাহানের বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও প্রসিদ্ধ অলিআল্লাহ হযরত ইমাম শেখ আবু আবদুল্লাহ শরফুদ্দীন বুশাইরী (রহ.) মিশরের অন্তর্গত বুশাইর নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মশহুর আশেকে রাসূল বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রোগের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার হেকিমের স্মরণাপন্ন হয়ে তিনি অবশেষে আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে কালক্ষেপণ করতে লাগলেন।

একদিন কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে ইমাম বুশাইরী (রহ.) রহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে একটি কাসীদা (গীতিকাব্য) রচনা করেন। আর মনে মনে এই আশা করেন যে হয়তো এই পবিত্র কাসীদার অসিলায় আল্লাহ পাক' তাকে এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে শেফা দান করবেন। এই আশা নিয়ে তিনি কোন এক জুমারাতে এক নির্জন ঘরে বসে বসে কাসীদাটিকে বুকে জড়িয়ে মহান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমন্ত অবস্থায় ইমাম বুশাইরীর (রহ.) নবীজীর জেয়ারত নসিব হলো। তিনি দেখতে পেলেন তিনি তাঁর রচিত কাসীদাটি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পড়ে শুনাচ্ছেন আর আঁ হযরত মনোযোগের সাথে তাঁর পড়া শুনছেন। পড়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে ইমাম বুশাইরীর শরীরের পক্ষাঘাত আক্রান্ত অংশ মুছে দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর পাক দেহে জড়ানো কারুকার্যখচিত চাদরটি খুলে ইমাম বুশাইরীর শরীর ঢেকে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইমাম বুশাইরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জেগে দেখতে পেলেন, তাঁর গায়ে জড়ানো রয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত মহামূল্যবান একটি

চাদর। শুধু তাই নয় তিনি স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাঁর শরীরের যে অংশ অবশ হয়ে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গিয়েছে। তার যে পক্ষাঘাত রোগ হয়েছিল আর বহুদিন তিনি সেই রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন তার কোন আলামতই নেই। তিনি মহাখুশিতে আল্লাহ তায়ালা শোকরিয়া আদায় করার জন্য সেজদায় পড়ে গেলেন।

তার রচিত কাসীদায়ে বুরদার প্রথম কিছু পঙ্ক্তি এখানে দেয়া হল–

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيرَانٍ بِذِي سَلَمِ مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ

أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ

(কবিতাটির উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলা উচ্চারণসহ বইয়ের শেষ অংশে রয়েছে)

কাসীদায়ে বুরদা নামক অমর প্রাণ কবিতা রচনাকারী। মিসরীয় কবি শেখ বুশাইরী ১২৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শেখ মুসলেহউদ্দীন সাদী (রহ.)

পারস্যের বিখ্যাত মরমী কবি ও দার্শনিক আশেকে রাসূল শেখ মুসলেহউদ্দীন সাদী (রহ.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শানে চার পঙ্ক্তির একটি কাসিদা রচনা করতে গিয়ে লিখলেন :

বালগাল উলা বিকামালিহি
কাশাফাদ দোজা বিজামালিহি
হাসুনাত জামি উখিসালিহি

কিন্তু ছন্দ মিলিয়ে চতুর্থ পঙ্ক্তিটি আর লিখতে পারলেন না। বহু চিন্তাভাবনা করলেন কিন্তু কবিতাটি পূর্ণতা লাভ করছে না। এভাবে একদিন দুদিন কেটে গেল। তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। তৃতীয় দিন কবি সাদী একেবারে পাগলপারা হয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তাঁর সরদারে দুজাহান হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দীদার নসিব হলো। আঁ হযরত শেখ সাদীকে (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, "সাদী তোমার কী হয়েছে? তোমাকে এমন পেরেশান দেখাচ্ছে কেন?" জবাবে শেখ সাদী (রহ.) তাঁর পেরেশানীর কারণ খুলে বললেন। তখন রহমতুল্লিল আলামীন ﷺ বললেন, "সাদী, তুমি লিখ : "সাল্লু আলাইহি ওয়াআলাইহি।"

কবি সাদী (রহ.) স্বপ্নে তাই লিখলেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর হাতে একটা কলম এবং তাঁর সামনে রাখা কাগজে হুজুর ﷺ বর্ণিত পঙক্তিটি লেখা। সঙ্গে সঙ্গে শেখ সাদী (রহ.) সেজদায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হামদ ও নাত পাঠ করে শোকরিয়া আদায় করলেন। এভাবে প্রিয় নবী ﷺ তার আশেক কবি শেখ মুসলেহ উদ্দীন সাদীর (রহ.) পেরেশানী দূর করে দিলেন। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে চতুর্থ পঙক্তি পূর্ণ করার পর কবিতা হল এইরূপ :

بَلَغَ العُلَ بِكَمَا لِهِ   كَشَفَتْ الدُّجَ بِجَمَا لِهِ

حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَا لِهِ   صَلُّوْ عَلَيهِ وَآ لِهِ

বালগাল উলা বিকামালিহি   কাশাফাদ দোজা বিজামালিহি
হাসুনাত জামি উখিসালিহি   সাল্লু আলাইহি ওয়াআলাইহি

তিনি কামালাতের উৎকর্ষে আরোহণ করলেন স্বীয় মহিমায়।
অন্ধকারকে দূর করলেন নিজ সৌন্দর্যে।
তাঁর স্বভাব চরিত্র ছিল সবচেয়ে সুন্দর।
তাঁর ও তাঁর বংশধরদের উপর জানাই দরূদ ও সালাম

আরবী ভাষায় লেখা এ কবিতা সাতশত বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে গীত হচ্ছে অবিরাম। এ যেন কোন মানবরচিত কাব্য নয়, মনে হয় এটি একটি ঐশী বাণী। একজন হৃদয়বান কবীর নবী প্রেম কত গভীর ও অকৃত্রিম হলে তার রচনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারি প্রিয় রাসূলের স্বপ্নের মাধ্যমে। পারস্যের এই মরমী কবির অসাধারণ রচনাটি বিশ্বনবী ﷺ এর আত্মিক স্পর্শে চির অমরত্ব লাভ করে ধন্য হয়েছে।

ইশকে রাসূলের দৌলতে পূর্ণ এই আশেকে রাসূল নিজের জীবনে একবার চিন্তা করলেন যে, তিনি এমন একটি কবিতা রচনা করবেন, যার দ্বারা সম্পূর্ণ স্বার্থকভাবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর শান ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবেন। মাসের পর মাস তিনি চেষ্টা করলেন অসংখ্য পৃষ্ঠা ভরে তিনি কবিতা লিখলেন, কিন্তু তিনি শেষ করতে পারছেন না। শেষমেষ তিনি স্বীকার করলেন যে, কোনো মানুষের পক্ষে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমরা কেবল প্রিয়নবীর মাহাত্ম্যের কথা শুরু করতে পারি শেষ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এইজন্য শেখ সাদী (রহ.) তার এই অপারগতার কথা এই পঙ্ক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন

یا صاحب الجمال ویا سید البشر　　من وجهك المنير لقد نور القمر

لا یمکن الثناء کما کان حقه　　بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

হে সুদর্শন মহাপুরুষ, হে মানবজাতির নেতা,
আপনার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও আলোকিত
প্রিয়নবীর প্রশংসা তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী বয়ান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
কিন্তু একথা অতীব বাস্তব যে, আল্লাহ পাকের পর আপনিই শ্রেষ্ঠ

এই জগত নন্দিত বিশ্বকবি শেখ সাদী ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে সিরাজ (ইরানে অবস্থিত) শহরে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মাজারও উক্ত শহরে অবস্থিত।

ড. আল্লামা ইকবাল

উপমহাদেশের যে কয়েকজন ব্যক্তি অনবদ্য কাব্য- কবিতা রচনা সামগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রশংসিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ড. আল্লামা ইকবাল। উর্দূ, ফার্সী উভয় ভাষাতে ছিল তাঁর সুনিপুণ দক্ষতা। তাঁর রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা ও কবিতা হল ফার্সীতে আসারে খুদী (اسرار خودی), রুমুজে বেখুদী (رموز بیخودی) আর উর্দূতে বা'নগে দারা (بانگ درا), বা'লে জিবাঈল (بال جبریل), শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া (شکوہ، جواب شکوہ) ইত্যাদি।

তাঁর অধিকাংশ কবিতার মূল বিষয় ছিল মুসলমান জাতির গৌরবউজ্জল ইতিহাস এবং মুসলমানদের পুর্নজাগরণের আহবান।তাঁর রচনাসমগ্রের মধ্যে এমনও কিছু কবিতা ছিল যা একজন মুসলমানের কলবকে ইশকে রাসূল দ্বারা নূরানী করত। যেমন তিনি জওয়াবে শিকওয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শানে বলেছেন–

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسم محمد ﷺ سے اجالا کر دے

তুচ্ছরে আজ করগো উচ্চ প্রেমে পুণ্যে কর মহৎ
মুহম্মদের ﷺ নামের আলোকে উজ্জ্বল কর সারা জগৎ

জওয়াবে শিকওয়ার সমাপ্তি করেছেন এই দুটি আলেড়ন সৃষ্টিকারী পঙক্তির মাধ্যমে–

کی محمد ﷺ سے وفا تونے ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرে ہیں

মুহম্মদ ﷺ-কে ভালোবাসো তবে ভালোবাসা পাবে আমার,

'লউহ-কলম' হবে তোমার, মাটির পৃথিবী সে কোন ছার!

পূর্ব বিশ্বের কবি (شاعر مشرق) উপাধিপ্রাপ্ত, ইসলামী কবিতা জগতের এই অমূল্য রত্ন ১৯৩৮ সালের ২১ই এপ্রিল লাহোর শহরে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। লাহোর শহরের বিখ্যাত বাদশাহী মসজিদের পাশেই তাঁর মাযার রয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও কবিতা রচনায় অনন্য ভূমিকা পালনকারী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনিও নিজ লেখনীর ছোঁয়ায় আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসা তুলে ধরেছেন। মূলত বাংলাভাষায় নাতে রাসূল রচনায় তাঁর অবদানই সর্বাধিক। তাঁর কিছু নাত হচ্ছে–

নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন, সেইতো দু'জাহানের ধনী।

তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে

(এই কবিতাগুলো বইয়ের শেষে বিস্তারিতভাবে দেয়া হলো)

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকা শহরে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। কারণ তিনি কবিতার মাধ্যমে নিজ জীবনের শেষ ইচ্ছার প্রকাশ করেছিলেন এভাবে-

মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই,

যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

ওয়াজ ও আলোচনা

মহানবীর জন্ম, জীবন তথা সীরাতের আলোচনা

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন ইসলামের মূর্ত প্রতীক। ইসলামের ব্যপারে কোন আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে না নবীর আলোচনা ব্যতীত। তার চরিত্র সম্বন্ধে মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○ (سورة القلم -٤)

অর্থ ঃ আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী (সূরা আল-কলম-৪)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ
وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ○ (سورة الأحزاب ٢١)

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ এর মধ্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।
(সূরা আল আহযাব-২১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং কুরআন শরীফে প্রিয়নবী এবং তাঁর চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এবং মুমিনদের তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মিলাদ ও মাহফিলে যে ওয়াজ নসীহত করা হয় সেখান থেকে আমরা যেমন নবীর জন্ম সম্বন্ধের নানা অলৌকিক ঘটনা জানতে পারি একই ভাবে নবীর জীবন ও তাঁর পবিত্র সীরাত সম্বন্ধে আরো নানা শিক্ষণীয় বিষয় জানতে পারি।

মিলাদ মাহফিলের একটি খুব বড় বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা হচ্ছে এই যে এর মাধ্যমে আমরা যেমন কিছুক্ষণ একত্রিত হয়ে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করি একই ভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবন সম্বন্ধে জানতে পাই। আমরা সাধারনত আমাদের দৈনন্দিন সাংসরিক জীবনে এত ব্যস্ত থাকি যে এসব ধর্মীয় ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি শুনার বা জানার সুযোগ থাকে না। এ দিক দিয়ে মিলাদ মাহফিল আমাদের মাঝে একটি বিরাট উপলক্ষ সৃষ্টি করে এসব প্রয়োজনীয় বিষয়াদি জানার জন্য। একদিক দিয়ে আমরা যেমন মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার সুযোগ পাই তার পাশাপাশি আলেম ও ওলামায়ে কেরামদের মুখ থেকে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর জন্ম, জীবন আদর্শ তথা তাঁর নূরানী সীরাত সম্বন্ধে নানা গঠনমূলক আলোচনা শুনে নিজের জীবনকে ইসলামের আলোকে গড়তে পারি।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে আরো বলেছেন–

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(سورة آل عمران ١٦٤)

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে তিনি একজন নবী বানিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

(সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪)

তাঁর চরিত্রের মাহাত্ম্য হাদীসের ভাষায় এভাবে এসেছে–

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – اِنَّ اللهَ بَعَثَنِى لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ ○ (مشكوة)

অর্থ ঃ হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন। (মিশকাত)

তাই নবী করিম ﷺ এর জন্ম, জীবন আদর্শ তথা সীরাত সম্বন্ধে আলোচনায় কারো দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। তবে তার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোন ভুল, মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত তথ্য দিয়ে মহানবী ﷺ এর চরিত্রের বর্ণনা না করা হয়। কারণ এর মাধ্যমে যেভাবে নবীর মর্যদার সাথে বেয়াদবী করা হবে একইভাবে আলোচনার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই বিপুল গুনাহের অধিকারী হবে।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ　　　مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

প্রিয় নবী এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার ফযীলত ও মাহাত্ম্য অনেক। এ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন।

إِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ (سورة الأحزاب ٥٦)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ মহানবীর প্রতি দরূদও সালাম (রহমত) বর্ষণ করছেন। অতএব হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো। (সূরা আল-আহযাব-৫৬)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এখানে একটি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে অনেকগুলো কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন।

যেমন মহান আল্লাহ পাক প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। তাই তো এরশাদ হচ্ছে–

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ○ (سورة البقرة ٤٣)

অর্থ : আর নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। –(সূরা বাকারা : ৪৩)

আবার পবিত্র রমযানের সিয়াম সাধনা যা পালন করা প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের উপর ফরয। এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ (سورة البقرة ١٨٣)

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের জন্য, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। –(সূরা বাকারা : ১৮৩)

আবার প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তিরও কর্তব্য মহান আল্লাহর ঘর পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে হজ্জ পালন করা। তাইতো আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ ○ فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ○

(سورة آل عمران ٩٦-٩٧)

অর্থ : নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় (মক্কা) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে 'মাকামে ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে।

আর এ ঘরের হজ্জ করা হল মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না তার জানা উচিত, যে আল্লাহ্ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।

(সূরা আলে-ইমরান : ৯৬-৯৭)

এখানে শরীয়তের প্রতিটি কাজের হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন, কিন্তু কোন কাজ আল্লাহ তাঁর বান্দাকে করতে বলার আগে নিজে করে দেখান নি। যেমন পুরো কুরআনে কোথাও এরকম নেই যে আল্লাহ বলছেন যে আমি আল্লাহ নামায পড়ি তাই তোমরাও নামায পড়, আমি আল্লাহ রোযা রাখি তাই তোমরাও রোযা রাখ অথবা আমি আল্লাহ যাকাত দেই তাই তোমরাও যাকাত দাও এরকম নেই। কিন্তু প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা এমন একটি আমল যা সর্বপ্রথম আল্লাহপাক নিজে করেছেন এরপর ফেরেশতাদের তার সাথে নিয়ে নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন এবং পরিশেষে তাঁর ঈমানদার বান্দারদেরকে এই কাজ করার হুকুম দিয়েছেন। এইজন্য তো বলা হয়–

دہر میں تو سب سے بڑا　　تجھ سے بڑی خدا کی ذات

بھیج رہا خدا بھی تجھ پہ درود اور سلام

সৃষ্টির মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহপাক এর সত্তা
সেই আল্লাহপাক ও আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছেন

এখানে আলোচ্য আয়াতের - إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ যেখানে يُصَلُّوْنَ (ইউসাল্লুনা) শব্দটি এসেছে যা ঘটমান বর্তমান এবং ধারাবাহিকভাবে ঘটিতব্য (ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক) ক্রিয়া। এই শব্দ দ্বারা এই অর্থই প্রকাশিত হয় যে মহান আল্লাহ বর্তমানে নবী করিম ﷺ এর প্রতি রহমত নাযিল করছেন এবং অনাগত ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত রহমত নাযিল করতে থাকবেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণও বর্তমান নবী এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছেন করছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত করতে থাকবেন।

যদি আমরা সূরা আহযাবরে আয়াতকে এই গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পারব যে এই আয়াতের প্রথম অংশে এসেছে যে মহান আল্লাহ তার ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। এখানে একটি বিষয় অতীব গুরত্বপূর্ণ যে আল্লাহ একা নয় বরং ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে নবীর প্রতি দরূদ সালাম পেশ করছেন এবং তাঁর

সম্মান ও মর্যাদাকে আরো মহিমান্বিত করতে। তাই আমরা দুনিয়াতে বসে যখন একত্রিত হয়ে কোনো মিলাদ মাহফিল বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে প্রিয়নবীর প্রতি যে দরূদ ও সালাম পড়ছি মহান আল্লাহ নিজেও তার ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে তার পবিত্র আরশে নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করছেন। তাই আমরা যখন আল্লাহর নবীর প্রতি দরূদ সালাম পড়ছি আমরাও তাদের সাথে শামিল হয়ে যাই।

এই আয়াতের শেষ অংশে একটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাদের নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে বলেছেন। এখানে মহান আল্লাহ তার ঈমানদার বান্দাদের নবীর প্রতি দরূদ পড়ার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ অনেক বার يَا أَيُّهَا النَّاسُ (ইয়া আইয়্যুহান্নাস) অর্থাৎ হে মানবজাতি কথাটি উল্লেখ করেছেন। আবার অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন– يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (ইয়া আইয়্যুহাললাযীনা আমানু) অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ কথাটি উল্লেখ করেছেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে আল্লাহ, তার সমস্ত বান্দা সে মুসলমান হোক কিংবা অন্য ধর্মালম্বী হোক সবার উদ্দেশ্যে বলেছেন। আর কিছু বিশেষ কথা যা তিনি বলেন এবং যা করতে আদেশ করেন তার সেই সকল বান্দাদের যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ মুখে বলেছে–

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ۔

তা অন্তরে মেনেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে তাদের নির্দেশ দেন।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক তার বান্দাদের মধ্য হতে বিশেষ বান্দা তথা ঈমানদার বান্দাদের আল্লাহ নির্দেশ করছেন প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে। এভাবে আল্লাহ তাঁর অগণিত বান্দাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বান্দাদের নির্বাচিত করে এ কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে তারা বলে দেয় যে কেবল ১ম বিভাগ বা ২য় বিভাগ থেকে উত্তীর্ণরাই চাকুরী পেতে পারে। এভাবে তারা অসংখ্য প্রার্থীর মধ্যে থেকে ভাল ভাল প্রার্থীকে বাছাই করে চাকুরী প্রদান করে। তেমনি ভাবে মহান আল্লাহ তার অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর বিশেষ বান্দা অর্থাৎ ঈমানদার বান্দাদের নির্বাচিত করে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন যার ফলে প্রিয়নবীর খ্যাতি ও মর্যাদা আরো সুউচ্চ হয়।

দরূদ ও সালামের ফযীলত ও মাহাত্ম্য

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করার মর্যাদা ও ফযীলত অত্যন্ত বেশী। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার ফযীলত সম্পর্কে একটি ঘটনা হলো একবার আমাদের প্রিয়নবীর চেহারা মুবারকে আনন্দের ঝলক পরিলক্ষীত হচ্ছিল। তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চেহারা মুবারকে আজ যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এমনটি আর কোন দিন হয়নি, প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ করলেন এইমাত্র জিব্রাইল (আঃ) বিদায় নিল আর সে এই কথা বলছিল যে আপনার উম্মতের মধ্যে যে একবার দরূদ শরীফ পেশ করবে আল্লাহপাক এজন্য তার আমলনামায় দশটি নেকী নিদিষ্ট করবেন, দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। (হিসনে হাসীন)

সুবহানাল্লাহ কি মর্যাদা দরূদ শরীফের। অর্থাৎ আমরা যদি প্রিয়নবী ﷺ এর উপর একবার দরূদ ও সালাম পেশ করি, তবে আল্লাহ আমাদেরকে তিনটি পুরস্কার দিবেন।

- দশটি নেকী
- দশটি গুনাহ মাফ
- দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি

আমাদের মনে মাঝে মাঝে এ বিষয়ে খটকা লাগে আমাদের কুচিন্তা ও ইবলিসের ধোঁকাবাজীর জন্য যে প্রিয়নবীর ইন্তেকাল হয়েছে, তিনি তাঁর রাওজা মোবারক থেকে কিভাবে আমাদের সালামের জবাব দিবেন? আমাদের মনের খটকা প্রিয়নবী দুর করে দিয়েছেন এভাবে যে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এবং আবু দাউদ শরীফে বিষয়টি এসেছে যে প্রিয়নবী বলেছেন– "কোন ব্যক্তি যখন আমার প্রতি সালাম পেশ করে আল্লাহপাক আমার রূহ ফেরত দিয়ে দেন যাতে করে সালামের জবাব প্রদান করতে পারি।" অর্থাৎ আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে যে প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয়নবী তার রওজা মুবারক থেকে সে সালামের জবাব দিচ্ছেন।

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَا ئِبًا اُ بْلِغْتُهُ ○ (بيهقى)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরূদ পেশ করে আমি তা শ্রবণ করি এবং যে দূর হতে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে তা আমার নিকট পৌছানো হয়।" (বায়হাকী শরীফ)

মহান আল্লাহ পাক এমন কিছু বিশেষ ফেরেশতা তৈরী করেছেন, যাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে, বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যখন কেউ মহানবী ﷺ এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে সেটা সাথে সাথে নবীজির রওজা মুবারকে পৌঁছে দেন। যেমন হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَا ئِكَةً سَيَّا حِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ اُمَّتِي السَّلَامَ ۝ (مشكوة)

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন " আল্লাহর কতেক ফেরেশতা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌঁছান।" (মেশকাত)

তাছাড়া প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম অধিক হারে পেশ এর ফযীলত সম্বন্ধে উবাই ইবনে কা'ব থেকে হাদীসে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, "আমি প্রিয় নবী দরবারে এই আরজী পেশ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পেশ করতে চাই, আমি আমার দোয়ার মধ্যে কি পরিমাণ দরূদ শরীফ পেশ করব। হুজুরে আকরাম ﷺ এরশাদ করলেন যতখানি তোমার ইচ্ছা। দরূদ পেশ করতে থাকো। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক চতুর্থাংশ? প্রিয় নবী ﷺ এরশাদ করলেন তা তোমার ইচ্ছা তবে এর চেয়ে বেশী পরিমাণ দরূদ পেশ করা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি আরজ করলাম, তবে অর্ধেক প্রিয় নবী ﷺ এরশাদ করলেন তা তোমার ইচ্ছা। তবে দরূদের পরিমাণ এর চেয়ে বেশি করলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে, তখন আমি বললাম তবে দুই-তৃতীয়াংশ তিনি এরশাদ করলেন তা, তোমার ইচ্ছা তবে এর চেয়ে বৃদ্ধি করলে, তা তোমার জন্যই উত্তম হবে। এরপর আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহলে আমার দোয়ায় সমস্ত সময়টা আমি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণে ব্যয় করব। তখন প্রিয়নবী এরশাদ করলেন তবে এমন অবস্থায় তোমার সকল দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট হবে, আর তোমার গোনাহ মাফ করা হবে।" (তিরমিযী)

আল্লাম সাখাবী ইমাম আহমদের রেওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি যদি আমার সমস্ত সময়টা আপনার প্রদি দরূদ পাঠে ব্যয় করি তবে কেমন হয়? তখন প্রিয় নবী এরশাদ করলেন, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তোমার দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের সকল দুশ্চিন্তা দূরীভূত করার ব্যবস্থা করবেন।

উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আমাদের প্রিয়নবী তাঁর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ করাকে কত পছন্দ করেন। প্রিয়নবী

এর উপর দরূদ শরীফ পেশ করার ফযীলত সম্বন্ধে একটি হাদীস আছে যা হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যেখানে প্রিয় নবী এরশাদ করেছেন আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ প্রেরণ কর কারণ আমার প্রতি দরূদ তোমাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবে।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশকারীর মর্যাদা সম্বন্ধে হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন, "যে আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবে আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ এবং সালাম প্রেরণ করবেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

দরূদ ও সালামের পাঠকারীর মর্যাদা সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবী বলেছেন–

عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَوْلَى النَّا سِ بِى يَومَ الْقِيَا مَةِ اَكْثَرُ عَلَيَّ صَلَو ةً ○ (تر مزى)

অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন "কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে বেশী নিকটতম হতে সক্ষম হবে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী দরূদ ও সালাম পেশ করবে। (তিরমিযী)

কিয়ামতের দিন মহানবীর নিকটবর্তী হওয়া মানে তার শাফায়াতের নিকটবর্তী হওয়া। তারা শাফায়াত হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা ব্যতীত কোন মানুষ জান্নাতের কল্পনা করতে পারে না। এজন্য আউলিয়া কেরামগণ তাদের অজিফার সময়ের অধিকাংশই ব্যয় করতেন দরূদ শরীফ পড়ার জন্য। অনেকে অজীফা এবং তাসবীহ তাহলীল, যিকির হিসেবে কেবল দরূদ শরীফ পড়তেন। প্রকৃত পক্ষে নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা হচ্ছে আল্লাহ ও তার রাসূলের নৈকট্য অর্জনের একটি উপায়।

হযরত নবী করিম ﷺ এর পবিত্র নাম শোনা বা পড়া হলে তার উপর দরূদ ও সালাম পড়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে "একবার আমি প্রিয় নবীর এর দরবারে হাযির হলাম তখন মহানবী সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি সম্পর্কে বলব? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ অবশ্যই। তখন প্রিয়নবী এরশাদ করলেন যার সামনে আমার নাম নেয়া হয় আর সে আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে না সেই সবচেয়ে কৃপন ব্যক্তি।" (তিরমিযী)

একই বিষয় সম্বন্ধে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে–

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلبَخِيْلُ الَّذِ مَنْ ذُكِرْ تُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ○ (تر مزى)

অর্থ : হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বখিল বা কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। (তিরমিযী)

অর্থাৎ এ ধরনের ব্যক্তিই হলো সবচে বড় কৃপণ যারা হুজুরের নাম শুনে একটু দরূদ পড়বে। কিন্তু চরম অলসতা ও নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তা থেকে বিরত থাকে। দরূদ সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা–

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) زاد السعيد গ্রন্থে লেখেন যে, (১) যেহেতু কুরআনে হুজুরের প্রতি দরূদ পাঠ করার জন্য صَلُّوْا আদেশমূলক শব্দ এসেছে তাই প্রত্যেক মুসলমানের সারা জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরজ। (২) যদি একই মজলিসে কয়েকবার হুজুর ﷺ এর নাম উচ্চারণ করা হয়, তাহলে ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) এর মাসআলা হলো প্রত্যেকবার রাসূলের নাম উচ্চারণকারী এবং তা শ্রবণকারীর উপর দরূদ পড়া (অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পড়া) ওয়াজিব। তবে এ কথার উপর ফতোয়া নয়। প্রকৃত মাসআলা হলো, মাত্র একবার দরূদ পড়া ওয়াজিব। এরপর যতবারই নাম নেয়া হোক তখন প্রতিবারই দরূদ পড়া মুস্তাহাব। (৩) যখন জুম্মার খুতবায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর নাম মুবারক আসে অথবা খতীব (খুতবাদাতা) এই আয়াত–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

পড়বে তখন অন্তরে আস্তে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তথা দরূদ পড়তে হবে।

এই আলোচনা হতে জানা যায় যে কোন ব্যক্তির সামনে যদি নবীজির পবিত্র নাম হযরত মুহাম্মদ পড়া হয় তবে তার উপর নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা অর্থাৎ অন্তত একবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা ওয়াজিব হবে।

আমাদের উচিত শুধু মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে দরূদ শরীফ পড়া সীমিত না রাখা। বরং সকল ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রিয় নবী এর প্রতি নিয়মিত দরূদ ও সালাম পেশ করা উচিত। কারণ এ সম্বন্ধে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে" যে কোন মজলিস যদি প্রিয়নবী এর উপর দরূদ শরীফ পেশ না করেই মজলিস শেষ হয়ে যায় তবে তারা জান্নাতবাসী হলেও এই জন্য অক্ষেপ করবে। কেননা তারা সেদিন দরূদ শরীফের যে অসীম সওয়াব ও ফযিলত দেখতে পাবে তার জন্য তারা নিতান্ত অক্ষেপ করবে যে কেন আমরা আমাদের মজলিসে প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করি নি।"

এই হাদীসের আলোকে বলা যায় যে যাবতীয় দুনিয়াবী মজলিস সেটা ধর্মীয় হোক বা সামাজিক হোক তাতে যদি কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ না হয় তবে এ সকল মজলিসে নবীর প্রতি দরূদ সালাম পেশ করা সুন্নত।

তাই আমাদের উচিত শুধু ঈদে মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ সীমাবদ্ধ না করে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন শবেমেরাজ, শবেবরাত ও শবেকদর এর যে আলোচনামূলক অনুষ্ঠান হয় তাতে ও প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা। কারণ এর ফলে যে আমরা শুধু আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয় তা নয় বরং এর মাধ্যমে সেই মাহফিলও মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে।

দরূদ শরীফ প্রেরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমাদের প্রেরিত কোন দরূদ ও সালাম ব্যর্থ হচ্ছে না বরং সবগুলোই যথাযথভাবে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সামনে পেশ করা হচ্ছে এবং তিনি সেগুলোর জবাব দিচ্ছেন। এরচেয়ে বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার আর কিছুই নয় প্রিয়নবীর সালামের জবাব আমরা পাচ্ছি। তাই আমাদের সকল বিভেদ ভুলে আরও অধিক হারে বিশ্বনবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা উচিত।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ দরূদ শরীফের অসংখ্য মাহাত্ম্য ও ফযীলতের মধ্যে এখানে সামান্যই বর্ণনা করা হল। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর নবীর উপর বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পেশ করা। আমাদের মনে রাখতে হবে এটি এমন আমল যা মহান আল্লাহ নিজে তার আরশে ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করছেন। যখন আমরা এই আমল করি আমরাও তাদের সাথে শামিল হয়ে যাই। আল্লাহ আমাদেরকে এই আমল বেশী বেশী করার তৌফিক দান করুক।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللهِ

কিয়াম বা দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করতে বলেছেন। কিন্তু কিভাবে, কি অবস্থানে তা করতে হবে সেটি উল্লেখ নেই। এই দরূদ ও সালাম বসে ও দাঁড়িয়ে উভয়াবস্থায় পড়া যায় একাকীও পড়া যাবে এবং একত্রিত হয়ে মাহফিলেও পড়া যাবে। বসে পড়ার উপর সাধারণত কোন মতবিরোধ নেই, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়া নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। এখন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ তথা কিয়াম এর মধ্যমে দরূদ ও সালাম পেশ করা বিশ্লেষণ করা হবে।

কিয়াম (قِيَامٌ) শব্দের অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, স্থির হওয়া বা সোজা হয়ে দাঁড়ানো। মিলাদের ক্ষেত্রে আমরা এই শব্দ ব্যবহার করি দাঁড়িয়ে প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার ক্ষেত্রে। শরীয়তের দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পড়তে কোন বাধা নেই। মহান আল্লাহপাক যখন আমাদের এ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা তখন আমাদের দায়িত্ব যাতে তা যথাযথ ভাবে আদব ও সম্মানের সাথে করা। যেমন এটি অজু বিহীন ও অজু থাকা উভয় অবস্থায় পড়া যায় একইভাবে এটা যেমন বসে পড়া যায় দাঁড়িয়ে ও পড়া যায়।

কিন্তু এখানে বলে রাখা ভাল যে অজু বিহীন অবস্থায় দরূদ ও সালাম পড়ার চেয়ে অজু থাকা অবস্থায় পড়া উত্তম, ঠিক তেমনি বসে দরূদ ও সালাম পড়ার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যথাযথ আদব ও সম্মানের সাথে দরূদ ও সালাম পেশ করা উত্তম।

কিন্তু মিলাদ মাহফিলের বিরোধীতাকারীরা এখানে একটি হাদীস উপস্থাপন করে মিলাদে কিয়াম না করার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। এ সম্বন্ধে একটি হাদীস হযরত আবি উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা নবী করিম ﷺ আসলেন অতপর আমরা তার সম্মানার্থে দাঁড়ালাম। তখন নবী করিম ﷺ বলেন "তোমরা পারস্য দেশী যেভাবে একে অপরকে দাঁড়িয়ে (কিয়াম করে) সম্মান করে তোমরা আমাকে সেরূপ দাঁড়িয়ে সম্মানে করো না।" (মিশকাত শরীফ)

তাছাড়া একই বিষয় সম্বন্ধে আরেকটি হাদীস এসেছে যা হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (র) বর্ণনা করেছেন যে নবী বলেছেন, "যে ব্যক্তি এরূপ পছন্দ করে যে লোকেরা তার সামনে পুতুলের মত অর্থাৎ মুর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকুক সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়।" (তিরমীযী, আবু দাউদ)

এখন আশা যাক হাদীসগুলোতে যেখানে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পারস্য দেশী এদের অনুকরণে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ হচ্ছে সে সময় পারস্য দেশীয় লোক তথা ইরাক ও রোমের অধিবাসীরা তাদের রাজার সম্মানার্থে বাদশাহর সম্মানে দাঁড়াতে মূর্তির মত, নতজানু হয়ে এবং রাজা বা বাদশাহের অনুমতি ব্যতীত তার দরবার কেউ বসতে পারত না, সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। সে সময়ে মুসলমানেরা সেই দরবারে গিয়ে বসে পড়লে তারা তাদেরকে অসম্মানিত ও অপমানিত করা হয়। এই প্রেক্ষিতেই আমাদের প্রিয় নবী মুসলমানদেরকে কারো সামনে নতজানু হয়ে মুর্তির মত দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন কারণ এরকম সম্মান মানুষ কেবল আল্লাহকে করতে পারে এবং কেবল আল্লাহ পাকই এমন সম্মান পাবার যোগ্য।

কিন্তু এখানে মহানবী ﷺ দাঁড়াতে নিষেধ করেননি, বরং তিনি মুর্তির মত বা করে নতজানু হয়ে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি যদি গাছের ডালের উপর বসে সেই ডালকে কাটে এবং যদি লোকেরা তাকে বলে যে তুমি বোকার মত গাছের ডাল কেটো না এর মানে এই নয় যে গাছের ডাল কেটো না। বরং তাকে বলা হচ্ছে যে ঠিকভাবে গাছের ডাল কাটে, তা না হলে বোকার মত কাটতে গেলে সে নিজে আহত হবে।

একইভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ কোন বান্দাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে নিষেধ করেননি বরং তিনি সেরূপ ভাবে দাঁড়াতে বা দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে নিষেধ করেছেন যা কেবল আল্লাহর জন্য। পরে আমাদের মহানবী আরো বলেছেন এ সম্বন্ধে যারা পছন্দ করে তাদের সামনে লোকেরা নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান করে সে ব্যক্তি জাহান্নামী।

অর্থাৎ আলোচ্য দুটি হাদীসে আমাদের প্রিয়নবী কিয়াম করতে নিষেধ করেননি। বরং তার মধ্যে নির্হিত শিরক থেকে বাঁচতে বলছেন। তাছাড়া আমাদের প্রিয়নবী যথাযথভাবে কিয়াম করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে একটি হাদীস রয়েছে যেখানে যখন হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রাঃ) বিচারকার্য পরিচালনার জন্য মসজিদে নববীর নিকট পৌছিলেন তখন আমাদের রাসূল উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ "তোমাদের উত্তম ব্যক্তি বা তোমাদের নেতার সম্মানে তোমরা দণ্ডায়মান হও (কিয়াম কর)।" (সহীহ বুখারী)

এ হাদীসের আলোকে বলতে গিয়ে আল্লাহ ইমাম নববী (রাঃ) বলেন, আল্লামা বাগাবী ও আল্লামা খাত্তাবী বলেছেন যে সমাজ নেতা ও দরিদ্র নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে, জ্ঞানবান অভিভাবকদের প্রতি এবং ছাত্রদের শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক কিয়াম করা ও দণ্ডায়মান হওয়া এ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়, মাকরূহ নয়।

'আবু দাউদ' কিতাবে কিয়াম সম্বন্ধে একটি হাদীস আছে যেখানে হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "হুযুর পাক যখন তার ঘর থেকে বাইরে আসতেন তখন আমরা উপস্থিত সকলেই তার তাযীমের জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম।"

মিলাদে কিয়াম সম্বন্ধে ও এর সমর্থনে তিরমিযী শরীফে একটি হাদীস আছে যা হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রাঃ) যখনই হুজুর পাকের নিকট আসতেন হুযুর পাক তার তাযীমের জন্য কিয়াম করতেন, আবার যখন প্রিয় নবী তার নিকট যেতেন, তিনি ও প্রিয়নবীর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার যে হুকুম সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতে আছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

এখানে আলোচ্য আয়াতের সমাপ্তি হচ্ছে تَسْلِيْمًا শব্দ দ্বারা। এর অর্থ হচ্ছে সালাম বা স্বীকৃতি। এই আয়াতের মধ্যে تَسْلِيْمًا শব্দ যোগের ফলে অর্থ দাঁড়ায় "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সালাম প্রেরণ করো, (মহানবীর প্রতি) যথাযথভাবে।"

সম্মানিত পাঠক, এখানে মহান আল্লাহ পাকই জানিয়ে দিচ্ছেন, আমরা যেন প্রিয়নবীর প্রতি উত্তমরূপে দরুদ ও সালাম পেশ করি এবং একজন মুসলমান তখনই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর যথাযথভাবে দরূদ ও সালাম পেশ করতে পারবে যখন সে দাঁড়িয়ে পেশ করবে।

যখন কোনো ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রিয়নবীর রওজার সামনে সালাম পেশ করে সেও তো দাঁড়িয়ে পেশ করে। তাই নবীজীর রওজার সামনে সালাম পেশ করা এবং অন্য যে কোনো স্থান থেকে কেয়াম করা বা দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করা একই বিষয়, শুধু স্থানের পার্থক্য হবে। সওয়াব বা ফযীলতের কোনো তারতম্য হবে না। কারণ, প্রিয়নবী বিশ্বের যে কোনো স্থান থেকে প্রেরিত দরূদ ও সালামের জবাব সাথে সাথে প্রদান করেন।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হলো শরীয়াতের দৃষ্টিতে একে অপরের প্রতি সম্মানের উদ্দেশ্য দাঁড়ানো তথা কিয়াম করা জায়েজ। তাছাড়া মূল বিষয় হচ্ছে প্রিয় নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা, তা বসে হোক অথবা দাঁড়িয়ে সালাম এর মাধ্যমে কিয়াম করা। আমাদের মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে এ বিতর্ক রাখা উচিত নয় যে কেবল বসে নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা যাবে অথবা কেবল দাঁড়িয়ে করা যাবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়াবস্থাই জায়েজ। তবে আমাদের একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা নবীর প্রতি যে দরূদও সালাম প্রেরণ করছি নবীজি তাঁর রাওজা মোবারক থেকে তার জবাব দিচ্ছেন। অতএব যখন আমাদের সালামের জবাব প্রিয়নবী দিচ্ছেন তখন আমাদের ও উচিত যথাযথ সম্মান আদব ও মর্যাদার মাধ্যমে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এরূপ সম্মান ও আদব প্রদর্শনের জন্য অনেক ওলামায়ে কেরাম মিলাদে কিয়াম করাকে জায়েয, উত্তম, মুস্তাহাসান বা মুস্তাহাব বলেছেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ　　　مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

কিয়ামের মধ্যে "ইয়া নবী সালামু আলাইকা" বলা ঠিক কি না

মিলাদ মাহফিলের বিরোধিতাকারীরা অনেক সময় একটি খোড়া যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যে, "ইয়া নবী সালামু আলাইকা" (হে নবী আপনার উপর আমার সালাম) এর মাধ্যমে তো উপস্থিত ব্যক্তির নিকট সালাম পেশ করা হয়। কিন্তু নবী তো আমাদের সামনে উপস্থিত নন। তাহলে এভাবে সালাম দেয়া তো সঠিক হবে না।

তাদের এই খোঁড়া প্রশ্নের জবাব রয়েছে আমাদের নামাযের মধ্যে প্রতিটি নামাজ সেটা ফরজ সুন্নত, নফল হোক তার মধ্যে একটি অন্যতম ওয়াজিব আরকান হচ্ছে তাশাহুদ। যদি কোন ব্যক্তি নামাযে ভুল বশত তাশাহুদ পড়তে ভুলে যায় তবে তার উপর সাহু সিজদায় ওয়াজিব হবে, এবং কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাশাহুদ না পড়ে তবে তার নামায হবে না, এবং নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

নামাজের এই ওয়াজিব আরকান তাশাহুদের মধ্যে একটি বাক্য আছে যেখানে আমরা বলি

"আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীউ" السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

এরও অর্থ হচ্ছে (হে নবী আপনার উপর আমার সালাম) অর্থাৎ আমরা নামাজের মধ্যে নবীর প্রতি এভাবে দরূদ ও সালাম পেশ করি যেভাবে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য কেউ কাউকে সালাম করছে।

"তাছাড়া ইয়া নবী সালামু আলাইকা" কথাটির অর্থ এবং "আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীউ" কথাটির একই অর্থ। এবং এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় যে আমরা এই বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রিয় নবীর প্রতি যে সালাম পেশ করছি যে তা খালি যাচ্ছে না বা ব্যর্থ হচ্ছে না বরং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রাওজা মোবারক থেকে সে সব সালামের জবাব দেন। আমাদের প্রিয় নবী যে তার কবরে সশরীরে জীবিত আছেন, এ সম্বন্ধে একটি হাদীস এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন "জুমার দিনই সবচেয়ে ফজিলতের দিন, এই দিনে কিয়ামতের জন্য সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তোমরা এই দিনে আমার উপর বেশী বেশী করে দরূদ শরীফ পড়বে। এই দিনে তোমরা যখন আমার প্রতি দরূদ সালাম পড়বে তখন তা আমার সামনে পেশ করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার সামনে কিভাবে পেশ করা হবে, ওফাতের পর আপনার হাঁড় পর্যন্ত থাকবে না। তখন নবী বললেন আল্লাহ পাক জমিনের জন্য নবীদের শরীর বিনষ্ট করা হারাম করেছেন।" (সহীহ বুখারী)

তাছাড়া এই বইয়ের দরূদ শরীফের ফযীলত অংশে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে যে আল্লাহ পাক ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন যার কাজ হচ্ছে বিশ্বের যে কোন

প্রান্ত থেকে কেউ যদি প্রিয়নবীর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করে তবে সে নবীর কাছে নিয়ে আসে এবং প্রিয়নবী তার সালামের জবাব দেন।

প্রিয় নবীর এ সকল হাদীসের আলোকে উম্মতে মুহাম্মদীর বিজ্ঞ আলেমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার রওজা মোবারকে সশরীরে অক্ষত অবস্থায় আছেন তাই এ হিসেবে আমাদের ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলাও জায়েজ কারণ আমাদের প্রিয়নবী তার প্রতি প্রেরিত সকল সালামের জবাব দিচ্ছেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

দোয়া

দোয়া হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করা বা তাঁর নিকট কিছু চাওয়া। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন "দোয়া হচ্ছে ইবাদতের সারবস্তু।" আমাদের নবী এর মাধ্যমে দোয়ার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন।

মিলাদের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে বেশ কিছু দল আছে যার মধ্যে কিছু দলের লোকেরা দোআ করাকে জায়েজ মনে করে। কিন্তু আবার কিছু ধরনের এমন লোকও আছে যারা এরূপ বলে থাকে যে আল্লাহ তো আমাদের মনের সব কথা জানেন এটি আলাদাভাবে তার কাছে দোআ চাওয়ার দরকার কি (নাউযুবিল্লাহ) তাদের এরকম উদ্ভট চিন্তার জবাব মহান আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে এভাবে দিচ্ছেন।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○ (سورة البقرة - ١٨٤)

অর্থ ঃ হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাদেরকে বলে দাও যে আমি তাদের অতি নিকটে। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি, কাজেই আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। এই সব কথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়ত তারা প্রকৃত পথের সন্ধান পাবে। (সূরা আল বাকারা-১৮৬)

এখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন যে তিনি আমাদের অতি নিকটে এবং তিনি আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে থাকেন। আল্লাহ আমাদের এটাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তার আহবানে সাড়া দেয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শুধু তাই নয় এই জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন-

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○ (سورة البقرة - ١٨٤)

অর্থ ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব, আর তোমরা আমার শোকর আদায় কর এবং আমার নিয়ামতের কুফরী করো না। (সূরা আল বাকারা-১৫২)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা যখনই আল্লাহকে স্মরণ করি তখন আল্লাহ ও আমাদেরকে স্মরণ করেন। আমরা যখনই আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করি, নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা আল্লাহর দরবারে পেশ করি সেটা দিন হোক বা রাত আল্লাহ তা দেখেন ও শুনেন। বরং আল্লাহ পছন্দ করেন যে বান্দা তার নিকট থেকে কিছু চায়। যারা এরকম করে না তাদেরকে আল্লাহ নিজের নেয়ামতের কুফরী করা হতো বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

আল্লাহর দরবারে দোআ কিভাবে করতে হবে এ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলছেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ○ (سورة الأعراف ٥٤)

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো কান্না জড়িত কণ্ঠে এবং সংগোপনে। (সূরা আল-আ'রাফ-৫৫)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ চান যে তার বান্দা তাকে স্মরণ করে তার কাছে চায় এবং মহান আল্লাহ তার জবাব দেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ কুরআনে আরো বলছেন।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ○ (سورة المومن ٦٠)

অর্থ ঃ তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক এবং আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্চিত হয়ে। (সূরা আল-মুমিন-৬০)

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে আমাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন। তাছাড়া এখানে আল্লাহ আরো বলেছেন যারা অহংকার করে ইবাদাত থেকে ফিরে থাকে তাদেরকে তিনি জাহান্নামে দাখিল করবেন কারণ তারা আল্লাহকে ডাকে না বা স্মরণ করে না। স্মরণ করলেও পূর্ণ সম্মান ও বিনয়ের সাথে স্মরণ করে না।

এইজন্য মহান আল্লাহপাকের এই আহবান ড. আল্লামা ইকবাল নিজ এইভাবে সাজিয়েছেন–

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے رہروِ منزل ہی نہیں

দয়ার ভাণ্ডার উন্মুক্ত আমার ; দান নেবার প্রার্থী কোথায়

কাকে আমি পথ দেখাব; পথ চলার পথিক কোথায়

মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে মহান আল্লাহর দরবারে দোআ করা হলে সেই দোআ অন্যান্য সময়ে করা দোআর চেয়ে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যর অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ মিলাদ মাহফিল হচ্ছে এমন একটি আমল যেখানে অধিক পরিমাণে নবীজির প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা হয় যা দোআ কবুলের অন্যতম শর্ত। তাছাড়া দোআর মধ্যে আমাদের সবার উচিত নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা। কারণ নবীর উপর দরূদ ও সালাম না পড়া হলে সেই দোআ আল্লাহর দরবারে যায় না। এ সম্বন্ধে একটি হাদীস হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, "যে পর্যন্ত প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ পেশ করা না হয়, সে পর্যন্ত আসমান ও যমীনের মধ্যে দোয়া লটকে থাকে তথা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পৌঁছে না।" (তিরমিযী)

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ সর্বাবস্থায় মাকবুল। এই হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, দুআকে দরূদের উপর মাউকুফ রাখা হয়েছে যাতে দরূদের উসিলায় দোয়াও কবুল হয়ে যায়। হিসবে হাসীন গ্রন্থে হযরত শায়েখ আবু সুলাইমান নদভী (রহ.) বলেছেন, 'যখন তুমি আল্লাহর নিকট কোনো প্রার্থনা করতে চাও তবে পূর্বেই দরূদ পড়ে নাও। এরপর যা ইচ্ছা দোয়া কর, এরপর দরূদের মাধ্যমেই দোআ শেষ কর। কেননা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পাক এই দুই পাশের দরূদ ও সালাম কবুল করবেন। আর যখন দুই পাশের কথা কবুল করবেন তখন আশা করা যায় তিনি আমাদের দোয়াও কবুল করবেন।

এ সকল মজলিশে দোআ করার উদ্দেশ্য হল যে এই মাহফিলে এতক্ষণ যা ইবাদাত করা হল কুরআন আয়াত থেকে নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা পর্যন্ত সে সবে যা ভুল ত্রুটি হয়েছে মহান আল্লাহ যেন তা ক্ষমা করেন এবং প্রিয়নবীর ওয়াছিলায় আমাদের সব গুনাহ মাফ করে তার প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ অনুসরন করার তৌফিক যাতে আল্লাহ দান করেন। তাছাড়া এসকল মজলিশে নানা বয়সের অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয় এবং এদের মধ্যে আল্লাহর বিশেষ বান্দারা বা মাসুম বান্দারাও থাকেন। তাই অনেক সময় মহান আল্লাহ তাদের এই বিশেষ বান্দা বা মাসুম বান্দাদের বদৌলতে উপস্থিত সকলের দোআ কবুল করে নেন।

তাই মিলাদ মাহফিলে আল্লাহর দরবারে দোআ প্রার্থনা করা শুধু জায়েযই নয় বরং অন্যান্য মজলিশ থেকে এসকল মজলিসে দোআ করা অনেক উত্তম।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللّٰه

তাবারুক বিতরণ

মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান দোআর মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়। তারপর অনেকে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী মিলাদে উপস্থিত লোকদের নানা রূপ আপ্যায়ন করে থাকে। এখানে মিলাদের বিরোধিতাকারীদের কোনরূপ আপত্তি থাকা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ একে অপরকে নিজের খুশি অনুযায়ী হালাল খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ন করানো কোন গুনাহের কাজ নয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য কাউকে আপ্যায়ন করানো একটি উত্তম কাজ। কারণ হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ○ (متفق عليه)

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো, ইসলামের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, তুমি অপরকে খাদ্য দিবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যখন কোন মিলাদ মাহফিল কারো ঘরে হয়ে থাকে অথবা অন্য কোন জায়গায় যেখানে লোকদের আসার দাওয়াত করা হয় মিলাদ অনুষ্ঠানে তখন আগত লোকেরা সেই গৃহকর্তা বা দাওয়াতকারীর মেহমান হিসেবে গণ্য হয়। এবং ইসলামের দৃষ্টিতে মেহমানদের আপ্যায়ন করানো সুন্নত। যদি মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান মসজিদে হয়ে থাকে তবেও তাবারুক বিতরণ করা যাবে এবং এমনটি করতে শরীয়তের কোন বাধা নিষেধ নেই। তাছাড়া এ সম্বন্ধে আমাদের প্রিয়নবী একবার সাহাবীদের বলেছিলেন যে "যদি তোমরা কখনও কোন বাগান থেকে গমন কর তবে সেখান থেকে কিছু ফল খেয়ে নিবে। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বাগান কোনটি, তখন নবীজি বলেন সেই মাহফিল যেখানে আল্লাহর যিকির হয়।" (হিসনে হাসীন)

মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে যেমন নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা হয় তেমনি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর যিকর ও তার প্রশংসা করা হয়।

এর ফলশ্রুতিতে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানও একটি বাগানের ন্যায় সুন্দর ও সুশোভিত হয়ে উঠে।

আমরা যারা মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করে থাকি তাদের মনে একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে মিলাদ মাহফিলে অবশ্যই তাবারুক বিতরণ করতে হবে অথবা আপ্যায়ন করাতে হবে। এ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে যে তাবারুক বিতরণ মূলত মিলাদ মাহফিলের সাথে জড়িত নয় এবং দোআর মাধ্যমেই মিলাদ মাহফিল শেষ হয়ে যায়। তাই আল্লাহর যাদের সামর্থ্য দেননি তাদের ধার দেনা করে আপ্যায়ন করানোর কোন দরকার নেই। এবং আল্লাহ যাদেরকে সামর্থ্য দিয়েছেন এসব তাবারুক বিতরন করার বা আপ্যায়ন করানোর ক্ষেত্রে তাদের নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

- মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে প্রিয় নবীর জীবন আলোচনা ও তার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। এগুলো ছাড়িয়ে তাবারুক বিতরণ যেন প্রধান বিষয় না হয়ে উঠে।
- লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তাবারুক বিতরণ করা উচিত নয়।
- তাবারুক বা আপ্যায়নের ক্ষেত্রে আভিজাত্য বর্জন করতে হবে এবং যাবতীয় বাহুল্য খরচ ও অপচয় থেকে বাঁচতে হবে।

মিলাদ মাহফিলের পর্যালোচনা
কুরআন ও হাদীসের আলোকে

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এতক্ষণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মিলাদ মাহফিল ও তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি আমলের বিশ্লেষণ করা হল। এখন আপনারাই একটি বারের মত চিন্তা করে দেখুন-

- কুরআন তেলাওয়াত কি ইসলাম সম্মত নয়
- হামদে বারী তাআলা কি ইসলাম সম্মত নয়
- নাতে রাসূল কি ইসলাম সম্মত নয়
- প্রিয়নবীর জীবনী আলোচনা করা কি ইসলাম সম্মত নয়
- প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করা কি ইসলাম সম্মত নয়
- আল্লাহর কাছে দোআ চাওয়া কি ইসলাম সম্মত নয়
- তাবারুক বিতরন করা কি ইসলাম সম্মত নয়

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, একটি বার চিন্তা করুন মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে যে যে কাজ বা আমল করা হয় তার সবগুলোই যদি ইসলামসম্মত হয় তবে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানটি ও ইসলাম সম্মত হবে। মিলাদ মাহফিলের প্রতিটি বিষয়ের

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যথার্থতা এটাই প্রমান করে যে মিলাদ মাহফিল ইসলাম বিরোধী নয় বরং ইসলামের আলোয় আলোকিত একটি অনুষ্ঠান।

মিলাদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কে এতক্ষণ যে দলিল পেশ করা হল, আশা করি তাতে আশেকে রাসূল বান্দাদের মনে আর কোন ভুল ধারণা অবশিষ্ট থাকবে না। এখন কোন মুসলমান নামধারী আলেম যদি কুরআন ও হাদীসের অর্থকে বিকৃত করে মিলাদ মাহফিলের মাহাত্ম্য ও ফযীলতের অপব্যাখ্যা করে কাউকে যদি বিপথগামী করার চেষ্টা করে, তবে তাদের এই কুচক্রান্ত হতে নিজেদেরকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে মিলাদ মাহফিল যে বরকতের ও রহমতের ওয়াছিলায়, এই বিষয়ে কারো সন্দেহ বা দ্বিমত থাকতে পারে না। যদি কারো অন্তরে হুযুর হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি প্রকৃত মুহাব্বত থাকে তবে সে মিলাদ শরীফকে আল্লাহর রহমত ও ফায়েজ হিসেবে তাযীম করতে বাধ্য। তাই উম্মতে মুহাম্মাদীর আউলিয়া কেরামগণ এবং পীর ও মাশায়েখ বৃন্দ মিলাদ মাহফিলকে মাথার মুকুট তুল্য মনে করে থাকেন। তাই বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় অপপ্রচারে কর্ণপাত না করে আদব ও তাযীমের সহিত সব সময় মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রিয় হতে চেষ্টা করা উচিত।

তাছাড়া পবিত্র শবেমেরাজ, শবেবরাত ও লাইলাতুল কদর এর সময়ে যে মাহফিলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণী শুনানো হয়, মিলাদ মাহফিল তথা প্রিয় নবীর প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করা হয় সে সকল অনুষ্ঠানেও আমাদেরকে মহান আল্লাহর রহমত ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া উচিত। যারা এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে না এবং নিজেদের মহান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে রাখে তাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু তাদের মোটেই উচিত হবে না এ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদেরকে এ সকল অনুষ্ঠান করা বা যোগ দেয়া হতে নিষেধ করা বা এসকল অনুষ্ঠানকে হারাম, কুফর বা শিরক বলা, কারণ এ সকল অনুষ্ঠানে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রশংসা করা হয় এবং মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত এ সকল মজলিশে বর্ষিত হয়।

মহান আল্লাহ যাতে আমাদেরকে মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠানে যাবতীয় শরীয়ত বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকার তৌফিক দেন এবং সঠিকভাবে এ সকল অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে নবীর সুন্নতকে অনুসরণ ও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয় সেই তৌফিক তিনি আমাদেরকে দান করুন। (আমিন)

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

মিলাদ মাহফিল সম্বন্ধে উলামায়ে কেরামের অভিমত

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের দিনে বা বছরের যে কোন দিনে, যে কোন সময়ে বিদআত ও শরীয়ত বিরোধী কাজ মুক্ত মিলাদ মাহফিল করা যায়। এ সম্বন্ধে বিশ্বের সুনামধন্য অসংখ্য ওলমায়ে কেরাম তাদের ওয়াজ, বক্তব্যে এবং তাদের ফাতওয়া দ্বারা এই পবিত্র কাজের বৈধতা ও শরীয়তসম্মত হবার ব্যাপারে তাদের রায় দিয়েছেন। আলোচ্য বইটি দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বের বক্তব্য ও অভিমত এখানে তুলে ধরা হল-

মাওলানা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র)-এর অভিমত

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র) তদীয় রেসালা গ্রন্থে শরীয়তের দৃষ্টিতে রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন নবী অনুষ্ঠান করার হুকুম কি? এ অনুষ্ঠান করা কি প্রশংসনীয় কাজ? না খারাপ কাজ। এ অনুষ্ঠানকারী লোকদেরকে কি এ কর্মের জন্য পুণ্য প্রদান করা হয়? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেন- "মিলাদ মাহফিলের আসল বিষয় হচ্ছে লোকদেরকে কোন এক এঞানে একত্রিত করা বা হওয়া। আর সে অনুষ্ঠানে কুরআন মাজীদ থেকে যথাসম্ভব কিছু (আয়াত বা সূরা) তেলাওয়াত করা আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম দিনের অলৌকিক ঘটনাবলী ও নির্দশনসমূহ আলোচনা করা। অতঃপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদেরকে যথা সম্ভব পানাহার করানো। আর এ কাজের জন্য অত্যাধিক বাড়াবাড়ি না হয় এমন পরিমাণে অর্থকড়ি দান সদকা করা ও ব্যয় করা। এ অনুষ্ঠান হচ্ছে শরীয়তের মাপকাঠিতে বিদআতে হাসানা শ্রেণীর কাজ। এ অনুষ্ঠানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এবং তার জন্ম হওয়ায় আনন্দ ও খুশী প্রকাশ করা হয়।"

হযরত শাহ্ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-এর অভিমত

উপমহাদেশের বিখ্যাত দার্শনিক আলেম ও মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) লিখিত "আল্ ইনতিবাহু ফী সালাসিলে আওলিয়া الانتباه فی سلاسل اولياء নামক গ্রন্থে মিলাদুন নবী প্রসঙ্গে লিখেছেন-"আমার সম্মানিত পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মদিনে খাদ্যসামগ্রী তৈয়ার করে তা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠাতাম। কোন এক বছর আমার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় আমি কোন খাদ্য সামগ্রী তৈয়ার করতে পারলাম না। আমার ঘরে সামান্য চানাবুট ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অবশেষে তা ভেজে লোকদের মধ্যে

বিতরণ করলাম। আমি রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, হযরত নবী করীম ﷺ সামনে চানাবুট রাখা হয়েছে।”

ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত আহমদ সিরহিন্দী (র)-এর অভিমত

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি (র) তার মাকতুবাতের তৃতীয় খণ্ডের ৭২ নং মাকতুবে (চিঠিতে) তার খলীফা খাজা হুসসামুদ্দীনের কাছে লিখেছেন যে, প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে সুললিত কণ্ঠে কুরআন মাজীদ, কাসীদা ও নাত পাঠ করা হয়। এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে খুব ভাল কাজ ও মুস্তাহাব কাজ। তিনি তৃতীয় খণ্ডের অন্য এক মাকতুবেও মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত মুজাদ্দিদ (র) মিলাদ অনুষ্ঠানে সিমা করতে ও গান বাজনা করতে নিষেধ করতেন। আর মিলাদ মাহফিলে হযরত নবী করীম ﷺ জন্মকাহিনী আলোচনা কালে কিয়াম করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

মুফতী এ আযম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকতীর (র) অভিমত

বাংলাদেমের অবিসংবাদিত আলেম ও ফকীহ, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক মুহাদ্দিস ও হেড মাওলানা, বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সর্বপ্রথম খতীব, মুফতী এ আযম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান নকশবন্দী মুজাদ্দেদী বারকাতী (র) মিলাদ মাহফিল ও কিয়ামকে মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান কাজ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। তিনি “সিরাজুম মুনীরা” নামক মিলাদ শরীফের একখানা কিতাব ও উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন। তিনি আজীবন নিজ তাসবীহ খানায় প্রতি বৃহস্পতিবার মিলাদ মাহফিল করতেন এবং তাতে কিয়াম করতেন। শেষে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তাবারুক বিতরণ করা হত। তিনি সেখানে একটি মসজিদ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বর্তমানে “মসজিদে মুফতী আযম ” নামে পরিচিত। তার ইন্তেকালের পরও মিলাদ মাহফিল ও কিয়াম করার ধারাটি তার মসজিদে এখনো প্রচলিত আছে।

এছাড়াও হযরত ইমাম কাস্তালনী (রহ.), হযরত শাহ আব্দুল হক দেহলভী (রহ.), হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (রহ.), ইবনে জাবের আন্দালুসী (রহ.), শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রহ.), ইমাম শামসুদ্দীন দামেস্কী (রহ.) ইত্যাদি এঁদের মতো বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব মিলাদ ক্বিয়ামের সমর্থনে ফতোয়া ও বই লিখেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই বাহরুল উলূম (ইলমের সাগর) যাঁরা কুরআন ও হাদীসের নিরিখে মিলাদ মাহফিলকে সমর্থন করেছেন ও পালন করার হুকুম দিয়েছেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُولَ اللهِ

চতুর্থ অধ্যায়

ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ আপত্তি ও তার জবাব

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

মহান আল্লাহ রাব্বুল তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশী মুহাব্বত করেন তিনি হচ্ছেন বিশ্ব মানবতার শান্তিদূত, প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, আহমাদে মুজতবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সারা দুনিয়ার মুসলমান তাঁর আগমনকে উদযাপন করে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল এর মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান দুনিয়াতে অনেক মুসলমান অহেতুক কারণে নিজে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল এর বিরোধিতা করছে এবং অন্য মুসলমানদেরও বারণ করছে। তাদের এ সংক্রান্ত কিছু আপত্তি রয়েছে যার প্রত্যেকটির জবাব এখন দেয়া হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

কুরআনের বাণী

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

হাদীসের আলো

اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَومَ الْقِيَامَة

আমি (মহানবী) কিয়ামাত দিবসে সকল মানুষের সর্দার হব।

শানে মুস্তাফা ﷺ

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں

মুহম্মদ ﷺ কে ভালোবাসো তবে ভালোবাসা পাবে আমার,

'লউহ-কলম' হবে তোমার, মাটির পৃথিবী সে কোন ছার!

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুলিল্লাহ এই বইয়ে এতক্ষণ কুরআনও হাদীসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিলের বৈধতা ও শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয হওয়ার দলীল তুলে ধরা হয়েছে। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বর্তমান সময়ে অনেকেই মিলাদ মাহফিল এবং ঈদে মিলাদুন্নবী কে কুফর, বিদআত এমনকি শিরক পর্যন্ত বলে থাকে। যারা মুসলমান সমাজের মধ্যে এ রকম বিশৃঙ্খলা বা বিতর্ক সৃষ্টি করে আমি তাদের সাথে এই বিতর্ক কেবল একটি প্রশ্ন দিয়ে শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে পবিত্র কুরআনে বা হাদীসের কোন জায়গায় আছে যে ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল করা এবং হুযুর হযরত মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম তথা দুনিয়ায় আগমনের দিনে কোনোরূপ আনন্দ খুশি করা যাবে না। আমাদের একটি জিনিস জেনে রাখা উচিত যে কোন কাজ, বিষয়, জিনিস বা বস্তুকে হারাম বলার জন্য বা নিষিদ্ধ হবার জন্য কুরআন এবং হাদীসের স্পষ্ট দলিল থাকতে হবে। যেমন মদ্যপান, মুর্তিপূজা, শিরক করা, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদির হারাম ও নিষিদ্ধ হবার সম্বন্ধে স্পষ্ট দলিল রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে। এই রকম দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম বলা যায় না।

তাই মাহফিলে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবীর বিরোধিতা কারীদের নিকট আমার একটি প্রশ্ন যে পবিত্র কুরআনের ৬৬৬৬টি আয়াতের মধ্যে কোন একটি আয়াত অথবা সিহাহ সিত্তার হাজার হাজার হাদীসের মধ্যে শুধু একটি হাদীস আমাদের সামনে পেশ করুন যেখানে আল্লাহ অথবা তার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এই মাহফিলে মিলাদকে অর্থাৎ তার জন্মের খুশিকে উদযাপন করতে নিষেধ করেছেন। আসলে তারা এরকম কোন আয়াত বা হাদীস খুঁজে পাবে না যেখানে একরম নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বরং এই মাহফিলে মিলাদ ও ঈদে মিলাদুন্নবী তো কুরআন ও হাদীস সম্মত। এবং মিলাদ মাহফিল যার মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আগমনের খুশি প্রকাশ করা হয় যার ফল বা পুরস্কার কি হবে তার জন্য আবু লাহাবের ঘটনাই যথেষ্ট যা এই বইতে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এতক্ষণ কুরআন এবং হাদীসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল এর বৈধতা সম্বন্ধে যে দলীল উপস্থাপন করা হল তা এর বৈধতা ও শরীয়তসম্মত হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তারপরও ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিলের কিছু কট্টর বিরোধিতাকারী আছে যাদের সামনে এই বিষয়ে শত শত

দলিল দিলে ও তারা তা মানবে না। কারণ তারা তাদের মনে এ সম্বন্ধে কিছু ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা খুবই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে। এখন কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের এই বিরোধমূলক চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসের খণ্ডন করা হবে।

সাধারণত ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিলের বিরোধিতাকারীরা কিছু সাধারণ আপত্তি এ বিষয়ে উপস্থাপন করে। এগুলো হল-

১) ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান প্রিয়নবীর সময়ে ছিল না তাই এটি বিদআত এবং পালন করা যাবে না।

২) ১২ই রবিউল আউয়ালে তে প্রিয়নবীর ইন্তেকালেরও। তাই সেই দিন হচ্ছে দুঃখ ও শোকের এবং এই দিনে কোন আনন্দ করা যাবে না।

৩) সৌদি আরবে মিলাদ মাহফিল বা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা হয় না, তাই মিলাদ মাহফিল করা ঠিক নয়।

৪) ঈদে মিলাদুন্নবী এটি হচ্ছে খৃষ্টানদের বড় দিনের ন্যায়। তাই খৃষ্টানদের অনুকরণ করা যাবে না।

৫) ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে যা কিছু খরচ হয় এগুলো কেবল অপচয়, ইসলামে অপচয়ের কোন সুযোগ নেই।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, যে কোন সাধারণ ব্যক্তি যে ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষার সাথে পুরোপুরি জ্ঞাত নয় বা ইসলাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞান নেই তারা সহজেই মিলাদ বিরোধীদের ফাঁদে পড়বে এবং মিলাদ মাহফিলকে খারাপ বুঝবে। মিলাদের বিরোধিতাকারীরা সব সময় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই পাঁচটি প্রশ্ন এর মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের মিলাদ মাহফিলের প্রতি বিদ্বেষী করে তুলে। এখন তাদের এই পাঁচটি খোঁড়া আপত্তির খণ্ডন করা হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাতে ভবিষ্যতে তারা কোন সাধারণ মুসলমানকে মিলাদ বিদ্বেষী না করে তোলে।

১ম আপত্তি

ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান নবীর সময়ে ছিল না তাই এটি বিদআত এবং পালন করা যাবে না।

জবাব ঃ মিলাদ মাহফিল বা ঈদে মিলাদুন্নবী সব সময় ছিল। বর্তমানে আমরা যেভাবে এগুলো উদযাপন করি সেটি প্রিয়নবীর বা সাহাবায়ে কেরাম এর সময় উদযাপনের চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য সব সময় এক ছিল যে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া এবং অন্তরে নবী প্রেম জাগ্রত করা।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিলের বিরোধিতাকারীরা এগুলোকে নতুন উদ্ভাবিত জিনিস ও বিদআত বলে দাবী করে এবং তাই তারা মিলাদ মাহফিল করাকে গুনাহের কাজ মনে করে।

بدعة আরবি শব্দ। بدع থেকে আগত যার অর্থ সূচনা করা নির্মাণ করা।[১] যেমন এই শব্দটি পবিত্র কুরআনেও এসেছে–

بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ٥

(سورة البقرة ١١٧)

অর্থ : তিনিই (আল্লাহ) আসমান ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি বলেন হও, তখন সাথে সাথে তা হয়ে যায়। (সূরা বাকারা : ১১৭)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যক্ত করেছেন بدعة শব্দ দ্বারা যে তিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী ও আসমানকে যেটা আগে ছিল না।

তাই লুগাতি দৃষ্টিকোণ তথা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে যে কোন নতুন জিনিসই যা কোন নমুনা ব্যতীত তৈরি করা হয় তাই বিদআত। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে সেই সমস্ত নতুন জিনিস যা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম ব্যতীত ও তাঁদের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ বা না করে দ্বীনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে বা শরীয়তের কোন অংশ বানানোর চেষ্টা করা হয় তাই বিদআত।

অতএব শাব্দিক বা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন নতুন কাজ ও কর্ম বিদআত। আর শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সমস্ত নব্য কাজ যা কুরআন ও সুন্নাহ বিপরীতে সেটিই হচ্ছে এই হাদীসের সেই বিদআত যার সম্বন্ধে রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন– كل بدعة ضلالة কিন্তু যদি সমস্ত নতুন কাজকে তথা এই হাদীসের আওতায় আনা ঠিক হবে না।

ইসলামের মধ্যে মহানবীর ওফাতের পর অনেকগুলো এমন কাজ হয়েছে যা পূর্বে ছিল না বা মহানবী তার জীবিতাবস্থায় এর নির্দেশ দেন নি। যেমন পবিত্র কুরআনের সমস্ত খণ্ডকে একত্রীকরণ, সেটাকে সূরা ও পারার সমন্বয়ে বিন্যাস করে সুন্দর কিতাবের আকৃতি দেয়া। এর কোনটিরই কিন্তু মহানবী কোন নির্দেশ দেন নি। কিন্তু মহানবীর ইন্তেকালের পর ইসলামকে ও কুরআনকে হিফাজতের জন্য সাহাবারা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া পরবর্তীতে উমাইয়া বাদশাহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইসলামের মধ্যে নতুন এক জিনিস অন্তর্ভুক্ত করে তা হচ্ছে

---

[১] আর বিদআত শব্দটি (বিদআ) অর্থ হচ্ছে আবিষ্কার বা প্রবর্তন করা নতুন জিনিস যা পূর্বে ছিল না।

পবিত্র কুরআনে হরকত এর ব্যবহার করা। আরবি ভাষায় সাধারণত যের যবর পেশ এর ব্যবহার নেই। কিন্তু অনারবীদের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য এই যের, যবর, পেশ যুক্ত করা হয়েছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, নিজেরাই এই বাস্তবতা অনুধাবন করুন, যদি সেই সময়ে তারা সব নতুন কাজকেই বিদআত' ও দালালাত বলে বন্ধ করে দিতেন তাহলে ইসলামের কি করুণ পরিণতিই না হতো। বিশেষ করে আমরা যারা অনারবী বা আজমী তাদের হরকতবিহীন কুরআন তিলাওয়াত করা কতটাই দুঃসাধ্য হয়ে যেত।

আসলে ইসলাম হচ্ছে এমন একটি দ্বীন যা আল্লাহ অনুমোদিত ও কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। তাই এই ইসলামকে হিফাজত, সুন্দর ও সাবলীল করার জন্য অনেক কিছু জিনিস সহকারী বা Supporting হিসেবে দরকার যাতে ইসলামের ভিত্তি মজবুতভাবে দণ্ডায়মান থাকে।

তাই শরীয়তের মধ্যে বিদআতকে সজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসানে কেরাম প্রথমেই বিদআতকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন : (১) বিদআতে হাসানা (উত্তম বিদআত) (২) বিদআতে সাইয়্যেআ (মন্দ বিদআত)।

যে সকল নব উদ্ভাবিত বিষয় কুরআনে ও হাদীস পরিপন্থি নয় বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে ও ইসলামকে সমুন্নত রাখার জন্য করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে বিদআতে হাসানা। যেমন : পবিত্র কুরআন মাজীদে হরকত সংযুক্ত করা, ত্রিশ পারায় ভাগ করা, হাদীসসমূহের বিভিন্ন কিতাব আকারে সংরক্ষণ করা, নামাজের ক্যালেন্ডার তৈরী করা ইত্যাদি বিদআতে হাসানার উদহরণ। অপরদিকে এমন সমস্ত কাজ যার কোন বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে নেই এবং ইসলামের নীতি পরিপন্থি কাজ যা নতুনভাবে হচ্ছে এগুলোকে বিদআতে সাইয়্যেআ বা মন্দ বিদআত বলা হয়। অর্থাৎ, যে সকল নবসৃষ্ট বিষয় ইসলাম বিরোধী সেই সকল বিদআতই হচ্ছে মানুষের পথ ভ্রষ্টতার কারণ এবং এই পথ ভ্রষ্টতাই মানুষকে জাহান্নামের পথিক করে তুলে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, বর্তমানে আমাদের সমাজে কিছু এমন লোক আছেন, যারা ইসলামী ইলম ও জ্ঞান গরীমায় নিম্নপর্যায়ের থেকে ঢালাওভাবে যে কোন নতুন জিনিসকে বিদআত বলে প্রচার করে। যার ফলে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হচ্ছে, মুসলমানদেরও বিভ্রান্ত করছে। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করব যা সাহাবায়ে কেরাম সম্পূর্ণ নতুনভাবে করেছেন। এইগুলো এমন সব কাজ যার নির্দেশনা মহানবী নিজের জীবনে দিয়ে যাননি, কিন্তু তারা সেইসব কাজ না করলে এবং সমস্ত নতুন কিছুই বিদআত এই ভয়ে বসে থাকলে সন্দেহাতিতভাবে ইসলাম তার অস্তিত্ব সংকটে পড়ত।

পবিত্র কুরআনের একত্রীকরণ

প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পূর্ণ কুরআন মার্জীদ লিখিত হয় কিন্তু তা ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর খেলাফতকালে ইয়ামামা নামক রক্তক্ষয়ী জিহাদে ৭০ জন হাফিজে কুরআন শহীদ হন। হযরত উমর ফারুক (রা.) এক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "এভাবে বিভিন্ন জিহাদে হাফিজগণ শহীদ হতে থাকলে কুরআনের অধিকাংশ বিশুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব আপনি কুরআন মাজীদ একত্রে সংকলনের ব্যবস্থা করুন।" তখন আবু বকর সিদ্দীক বললেন, "হে উমর, আপনি এমন কাজ সম্পাদন করার কথা বললেন, যা আল্লাহর রাসূল করেননি।" তখন উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ এতে কল্যাণ রয়েছে।

হযরত উমর ফারুক (রা.) এর পরামর্শ মতে হযরত আবু বকর (রা.) এই সাহসী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কাজের জন্য ওহী লেখক সাঈদ বিন সাবিতকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে কাগজের উপর কুরআন লিপিবদ্ধ করেন। এক বছর পরিশ্রমের পর কুরআন যখন গ্রন্থ আকারে লিপিবদ্ধ শেষ হয় তা খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর কাছে থাকে। তার ওফাতের পর হযরত উমর ফারুক (রা.) এর তত্ত্বাবধানে থাকে।

পবিত্র কুরআনের যথাযথ সংরক্ষণের জন্য তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) কর্তৃক সংরক্ষিত কুরআন শরীফের সাতটি অনুলিপি তৈরি করেন। বিভিন্ন হাফিজে কুরআনের কিরআত শ্রবণ ও মূল কপিটার সাথে মিল রেখে অনুলিপি তৈরি করা হয়। এরপর লিখিত অনুলিপির একটি হযরত উসমান নিজের কাছে রেখে অবশিষ্ট বিভিন্ন মুসলিম দেশের শাসনকর্তাদের নিকট প্রেরণ করেন যাতে সবাই বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। হযরত উসমানের (রা.) এই মহান কাজের জন্য তাঁকে জামিউল কুরআন বা কুরআন সংগ্রহকারী বলা হয়।

তারাবীহর নামায জামাতে ও ২০ রাকাত করে পড়ার নিয়ম

প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজ জীবনে তারাবীহ নামায আদায় করেছেন তবে সাহাবীদের সাথে নিয়মিত বা প্রত্যহ বিশ রাকাত এভাবে করে আদায় করেন নি। কারণ তাঁর মনে শঙ্কা ছিল যে, এভাবে করলে হয়ত এক সময় এই তারাবীহকে আল্লাহ ফরয করে দিবেন। তাই কিভাবে তারাবীহ পড়তে হবে তার কোন সুগঠিত নিয়ম মহানবী তাঁর জীবনে বলেন নি। এইজন্য সাহাবায়ে কেরাম বিক্ষিপ্তভাবে কেউবা মসজিদে, কেউ ঘরে তারাবীহ পড়তেন। এই নিয়ম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ইন্তেকাল ও উমর ফারুক (রা.) এর খিলাফতের সূচনা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

একদিন রমজানের রাতে মসজিদে নববীতে হযরত উমর ফারুক (রা.) গিয়ে দেখতে পান যে, সাহাবায়ে কেরাম বিক্ষিপ্তভাবে তারাবীহ আদায় করছেন। তাই তিনি চিন্তা করলেন এক ইমামের তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে জামাতবদ্ধ নামায আদায়ের নিয়ম থাকা উচিত। যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিন তিনি হযরত উবাই বিন কাব (রা.)[২] কে ইমাম বানিয়ে সুন্দরভাবে জামাতবদ্ধভাবে বিশ রাকাত করে তারাবীহ নামায পড়ার নিয়ম জারি করলেন। পরদিন তিনি যখন মসজিদে আসলেন তখন দেখতে পান একদল সাহাবায়ে কেরামের কাতারবদ্ধ হয়ে সুন্দরভাবে জামাতে নামায আদায়ের দৃশ্য। পবিত্র রমজান মাসের রজনীতে মসজিদে নববীতে এই সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করে হযরত উমর (রা.) বলেন, نعم البدعة هذا (আহা! কি সুন্দর বিদআতই না এটা)। পাঠকবৃন্দ আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে হযরত উমর ফারুক (রা.) যে উপায়ে তারাবীহ নামাযের প্রচলন করেছিলেন আজও প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশ সেই নিয়ম মোতাবেক নামায আদায় করছে। এমনকি বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে আহলে হাদীস ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ জামাতবদ্ধ বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায় করেন।

আরবী ব্যাকরণ علم نحو এর প্রচলন

পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর কোন সুগঠিত নিয়ম ও ব্যাকরণ রীতি মহানবীর যুগে ছিল না। আর মহানবী এমনটির কোন নির্দেশও দেন নি। খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে যখন ইসলামের ব্যাপক প্রচার ঘটে তখনই আরবী ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবু আসওয়াদ দুয়ালী হতে বর্ণিত, তিনি শুনতে পান একবার জনৈক ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত–

أَنَّ اللهَ بَرِیٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ –

যার অর্থ হচ্ছে– "নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট।" কিন্তু সেই ব্যক্তি ভুলবশত শেষের ل ও ه অক্ষরে পেশ এর পরিবর্তে যের দিয়ে পড়ছিল যার অর্থ দাঁড়ায় নিশ্চয়ই আল্লাহ অসন্তুষ্ট মুশরিক ও রাসূলের প্রতি (নাউযুবিল্লাহ)।

হযরত আবু আসওয়াদ দুয়ালী (র.) অনতিবিলম্বে বিষয়টি খলিফা হযরত আলী (রা.)-কে অবহিত করেন এবং আরবী ব্যবহারের মূলনীতি সংবলিত কিতাব রচনার অনুমতি চান। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, افصدنحوه অনুরূপ করুন। অর্থাৎ তাকে অনুমতি প্রদান করেন।

---

[২] ইনি এমন বিখ্যাত সাহাবী যার ব্যাপারে মহানবী বলেছেন, আমার উম্মতীর মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় আলেম হচ্ছে উবাই (রা.)।

হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (রহ.) হযরত আলী (রা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী نحوه কে বরকত মনে করে সর্বপ্রথম আরবী ব্যাকরণ রচনা করেন এবং তখন থেকেই আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র علم نحوه নামে স্বীকৃত।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এখানে আপনাদের সম্মুখে এমন তিনটি কাজের উদাহরণ দিলাম যা ব্যতীত বর্তমান ইসলামী জীবন কল্পনাও করা যায় না। এইজন্য অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এই নব বিষয় তথা বিদআতকে বিদআতে হাসানা ও বিদআতে সাইয়্যেআ হিসেবে ভাগ করেছেন। ইমাম নববী (রহ.) তাঁর শরহে সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এই বিদআতকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : বিদআতে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম।

আসল কথা হচ্ছে ওলামায়ে কেরামগণ যাবতীয় নব্য বিষয় তথা বিদআতকে শরীয়তের প্রধান দুটি মানদণ্ড তথা কুরআন ও হাদীস দিয়ে পরখ করেন। যখন এগুলো কুরআন হাদীস বিরোধী না হয় এবং ইসলামী শরীয়তের জন্য জরুরি হয় তবে গ্রহণ করেন। আর তা না হয়ে কুরআনে ও সুন্নাহ এর বিপক্ষে হলে তা পরিহার করেন এবং এই সমস্ত বিদআতের ব্যাপারেই রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন সমস্ত বিদআতই বিভ্রান্তি এবং সমস্ত বিভ্রান্তি জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

এই দৃষ্টিকোন থেকে যদি দেখা হয় তবে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল বিদআত নয়। কারণ প্রিয়নবীর জন্মের খুশি প্রকাশ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন প্রিয়নবী নিজেই নিজের আকীকা করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের সোমবার অথ্যাৎ আমাদের নবীর দুনিয়ার বুকে আগমনের দিন তথা তাঁর জন্মের দিনে রোযা রাখতে উৎসাহিত করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মিলাদ মাহফিল বা ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্দেশ্যগত দিক থেকে কোন নতুন বিষয় বা বিদআত নয় কারণ এটি নবী করীম ﷺ এর যুগ থেকে চলে আসছে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা যেভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল পালন ও উদযাপন করে থাকি তা সেই যুগ হতে অন্যরকম। এবং এই বিষয়টিকেই ভিত্তি করে মিলাদের বিরোধিতাকারীরা মিলাদ মাহফিলকে হারাম বলে থাকে। তারা তাদের এই যুক্তির জন্য একটি হাদীসও উপস্থাপন করে। হাদীসটি হচ্ছে كل بدعة ضلالة অর্থাৎ "সমস্ত বিদআতই ভ্রান্ত ও বাতিল।" এ হাদীসের সমস্ত কথাটিকে তারা সাধারণভাবে গ্রহন করেন। কিন্তু সাধারণের মধ্যে যে কিছু কিছু বিশেষ বিষয় আছে যা বিদআতের আওতাভুক্ত হয় না, সে মূলনীতিকে তারা অস্বীকার করেন। তারা প্রত্যেকটি বিদআতকেই গুনাহের কাজ বলে থাকে। অথচ বাস্তব কথা হল সাধারণভাবে সব বিদআতমূলক কাজ গুনাহের কাজ নয় ও

ভ্রান্ত ও নয়। বরং যে বিদআতগুলো কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামের শরীয়ত বিরোধীতা নয় এবং উত্তম ও ভাল কাজ বলে বিবেচিত হয় (বিদআতে হাসানা) সেগুলো পালনে সওয়াব লাভ হয়।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেই (র) বলেছেন যে সব নতুন উদ্ভাবনকৃত কাজ কুরআন অথবা সুন্নাহ অথবা ইজমা কিংবা সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হয় তাই হচ্ছে ভ্রান্ত বিদআত। আর যদি কল্যাণমূলক এমন কোন কাজ উদ্ভাবন করা হয় যা উল্লেখিত চারটি বিষয়ের বিপরীত বা পরিপন্থী না হয় তা হচ্ছে প্রশংসনীয় ও উত্তম বিদআত। মূলকথা হচ্ছে বিদআত হাসানা মুস্তাহাব হবার ব্যপারে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত।

তাছাড়া আলোচ্য হাদীসের ব্যখ্যায় ইমাম নববী বলেছেন- এ হাদীসে উল্লেখিত বিদআত হচ্ছে সে সব নব উদ্ভাবিত বিষয় যার শুদ্ধতার পক্ষে শরীয়তে কোন প্রমাণ মেলে না।

এমনিভাবে নবী করিম এর পরবর্তী যুগের যত আলেম ওলামারা আছেন তারা বিদআতকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন প্রশংসনীয় ও মন্দ। যে নতুন বিষয় প্রশংসনীয় ও ভালো তা বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত এবং যে জিনিসটি মন্দ তা বিদআতে সাইয়্যিআ বা নিকৃষ্ট বিদআত। এখন কোন নতুন উদ্ভাবিত জিনিষ বা বিদআত যে ভাল না মন্দ তা নির্ধারিত হবে কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তের আলোকে যে এটা তার পক্ষে যায় না বিপক্ষে, বা এটা ইসলামের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে, নাকি অকল্যাণ, অথবা এটি শরীয়ত সম্মত নাকি শরীয়ত বিরোধী। এবং এ সম্বন্ধে প্রিয় নবীর একটি বাণী আছে- নবী করিম ﷺ বলেছেন "যে ইসলামে কোন ভাল রীতির প্রচলন করল তার জন্য রয়েছে সওয়াব এবং যারা তারপর ঐ আমল করল তাদের সওয়াব, তবে তাদের সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না, আর যে ইসলামে কোন খারাপ রীতি প্রচলন করল তার জন্য রয়েছে সে কাজের পাপ এবং যারা তার পরে ঐ কাজ করবে তাদের পাপ। তবে তাদের কাজে কোন ঘাটতি হবে না।" (সহীহ মুসলিম)

বিদআত বা নবআবিস্কৃত জিনিস সম্বন্ধে প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ○ (متفق عليه)

অর্থ : হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্বন্ধে নতুন কোন কথা সৃষ্টি করেছে যা এতে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ খুবই পরিস্কার ভাষায় বলে দিচ্ছেন এমন কোন কিছু যেটা আমাদের দ্বীনের অংশ নয়, তারপরও সেটাকে ইসলাম বলে চালানো হয় সেটা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল এর মাহফিলে যে সকল কাজ করা হয় যেমন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, হামদ-এ-বারী তা'আলা নাতে রাসূল, নবী করিম ﷺ এর জীবনী তথা সীরাত আলোচনা, এ সবগুলোই আমাদের দ্বীনের অংশ। এই কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায় এই প্রত্যেক বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল বুঝানো হয়েছে। এই বিষয়গুলো সাহাবায়ে কেরামরাও বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে পালন করেছেন। আর ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল এর মাহফিলে সাধারনত এমন কিছু করা হয় না যার ফলে এটা বাতিল বা رَدٌّ হয়ে যাবে।

আমাদের দৈনন্দিন ইসলামী জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু বিদআতে হাসানা রয়েছে। এ রকম কয়েকটি বিদআতে হাসানা হচ্ছে−

- ❖ পবিত্র কুরআনে হরকত সংযোজন, কুরআন শরীফকে ৩০ পারা, ৭ মনযিলে ভাগ করা।
- ❖ নবী করিম ﷺ এর পবিত্র বাণীসমূহকে তথা হাদীসগুলোকে বই আকারে সংকলন করা। শুধু তাই নয় এর সাথে হাদীস শাস্ত্রের নিয়মকানুন তথা উসূলে হাদীস এটিও উত্তম বিদআত এর উদাহরণ।
- ❖ ফিকহ শাস্ত্র যা মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটিত নিত্য নতুন বিষয়ের ব্যাখ্যা ও সমস্যার সমাধান করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাও বিদআতে হাসানা। ফিকহ ও উসূলে ফিকাহ এর কোনটি নবীজির যুগে ছিল না তাই এগুলোকে বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত বলা হয়।
- ❖ ঘড়ির সময় অনুযায়ী নামায আদায় করা ও রোযা রাখা ও নামাযের সময়সূচীর ক্যালেণ্ডার তৈরী করা এগুলোও বিদআতে হাসানা।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এরকম আরো অনেক বিদআতে হাসানা রয়েছে যা মোটেই শরীয়ত বিরোধী নয় বরং শরীয়তের আহকামগুলোকে আরো শুদ্ধ ও সঠিকভাবে পালন করতে সহায়তা করে। এজন্য অনেকে বিদআতে হাসানাকে উৎকলিত সুন্নাত বলে রায় দেন কারণ এটি শরীয়ত বিরোধী নয় বরং শরীয়তের প্রমাণাদি একে গ্রহণের রায় দেয়।

مَرحَبا مَرحَبا رَسُول الله　　　　رَبِّ سَلِّم عَلٰی رَسُول الله

২য় আপত্তি

১২ই রবিউল আউয়ালে তো নবীর ইন্তেকালেরও দিন। তাই সেই দিন হচ্ছে দুঃখ ও শোকের এবং এই দিনে কোন আনন্দ করা যাবে না।

জবাব ঃ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তার রওজা মোবারকে অক্ষত ও হায়াতুন্নবী অবস্থায় রয়েছেন। এ সম্বন্ধে হাদীস রয়েছে যে, আমাদের প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন "আল্লাহ পাক জমিনের জন্য নবীদের শরীর বিনষ্ট করা হারাম করেছেন। (সহীহ বুখারী)

আমাদের প্রিয়নবী যে তার কবরে জীবিত আছেন এবং বর্তমানেও রয়েছেন এর সবচেয়ে সেরা প্রমাণ হল আমাদের কালেমা তাইয়্যেবা যা হচ্ছে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

এর অর্থ হচ্ছে– "আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রাসূল।" এখানে পুরো কালেমাটি হচ্ছে বর্তমান কাল (Present tense)। তাছাড়া কালেমার দ্বিতীয় অংশ যেখানে এসেছে "মুহাম্মদ ﷺ এর (আল্লাহর) রাসূল" এটিও একটি বর্তমান কালে এবং আমরা ভালোভাবেই জানি যে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য বর্তমান কাল ব্যবহার হয় না, জীবিত ব্যক্তির জন্যই বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি অন্যের সামনে নিজের শিক্ষক সম্বন্ধে বলে যে তিনি আমার শিক্ষক তাহলে বুঝতে হবে তার শিক্ষক জীবিত আছেন, কিন্তু কেউ যদি বলে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন তবে বুঝতে হবে তার শিক্ষক মারা গেছেন অথবা তিনি এখন আর সেই ব্যক্তির শিক্ষক নন। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আগে সব নবীর আগে থেকেই রাসূল ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহর রাসূল হিসেবে থাকবেন। অর্থাৎ আমাদের নবী আগেও নবী ছিলেন এখনও নবী আছেন এবং ভবিষ্যতেও তিনি আল্লাহর নবী থাকবেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ আমি মনে করি আলোচ্য প্রমাণটি নবীর জীবিত থাকার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। তবে আমাদের পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে এ বিষয় সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কুরআন ও হাদীসের দলিল দেয়া হল–

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন–

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ (سورة الأنبياء ١٠٧)

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি রহমত রূপে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

আল্লাহ আমাদের নবীকে সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রহমত রূপে প্রেরণ করেছেন। যদি নবী মৃত হতেন (নাউযুবিল্লাহ) অথবা অন্য মানুষদের মত মারা যেতেন তবে তো সৃষ্টির উপর যে রহমতের ধারা আসছে তা বন্ধ হয়ে যেত। তাই সমস্ত সৃষ্টির উপর রহমতের ধারা অব্যহত রাখার জন্য নবী তার রওজা মোবারকে জীবিত আছেন।

আল্লাহর রাসূল তো আরো বলেছেন–

من زار قبري وجبت له شفاعتي -

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।" (দারেকুতনী)

এই জন্য প্রত্যেক আশেকে রাসূল ও মুমিন ব্যক্তির মনের এই দুআ–

الٰہی دیکھا دے مجھے پھر دیار مدینہ

الٰہی بنا دے مجھے غبار مدینہ

হে আল্লাহ! আমাদের দেখিয়ে দিয়ো আবারো পবিত্র মদীনা,
এলাহী আমাকে বানিয়ে দাও মদীনার ধূলিকণা

শুধু তাই নয় আমাদের প্রিয়নবী ﷺ আরো এরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি আমার ইন্তেকালের পর আমার জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার জিয়ারত করল।" অথ্যাৎ এর মাধ্যমে আমাদের নবীজি এটা পরিষ্কার করেছেন যে তার জীবন ও আমাদের জন্য যে রূপ বরকতময় ছিল ঠিক তেমনি তার ইন্তেকাল পরবর্তী জীবন ও বরকতময়।

আলোচ্য হাদীসের প্রসঙ্গে হযরত ইমাম মালিক (র) বলেছেন যে "নবীর কবর জিয়ারত করেছি" কথাটি বলা ঠিক নয় এবং মাকরূহ। তার পরিবর্তে আমাদের বলা উচিত "আমি হুজুর পাকের জিয়ারত লাভ করেছি।"

আমাদের মহানবী ﷺ ইন্তেকালের পূর্বে জীবিত অবস্থায় যেমন ছিলেন ইন্তেকালের পরও সেরূপ জীবিত আছেন। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে ইন্তেকালের পর আমাদের নবী লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় তাকে আবু জেহেল, আবু লাহাব ও দেখতে পেত আবার হরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও উমর (রা) এর মত সাহাবীরাও দেখতে পেতেন, কিন্তু তার ইন্তেকালের পর তাকে দেখার যোগ্যতা কেবল আবু বকর (রা) ও উমর ফারুক (রা) এর মতে ঈমানদার ব্যক্তিদের রয়েছে। তাই অনেক সময় আল্লাহর বিশেষ বান্দা তথা আউলিয়া কেরামগণ স্বপ্নে নবীর দর্শন লাভ করেন।

আমাদের প্রিয়নবী হচ্ছেন হায়াতুন নবী

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। যেহেতু এটি মহান আল্লাহর অমোঘ বিধান "প্রত্যেক সৃষ্টিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে" তাই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন ও ইন্তেকাল করেছেন। তবে মনে রাখতে হবে তাঁর জীবন, মৃত্যু যেমন কোনটিই অন্য কোনো সাধারণ ব্যক্তির মতো নয় তেমনি তাঁর মৃত্যুপরবর্তী জীবনও আমার ও আপনার মতো নয়। বরং এটি তো তাঁর শান যে তিনি হায়াতুন্নবী।

হায়াতুন্নবী বলতে বুঝানো হচ্ছে যে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত রয়েছেন। পার্থক্য হচ্ছে এই– আগে দুনিয়াবী জীবন যাপন করতেন আর এখন তাঁর রওজা মুবারকে শুয়ে আছেন। সেখান থেকেই তো প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমাদের দরূদ ও সালামের জবাব দিচ্ছেন এবং তাঁর শরীরও মাটির সাথে মিশে যায় নি বরং অক্ষত আছে। কারণ হাদীসে রয়েছে, মাটি প্রিয় হাবীবের দেহকে নষ্ট করতে পারবে না। এছাড়াও তাঁর অনন্য জানাযা নামায, তাঁর স্ত্রীগণের সাথে অন্য কারো নিকাহ হারাম হওয়া, কবর থেকেও দরূদ ও সালামের জবাব দেয়া ইত্যাদি ইঙ্গিত বহন করে তিনি হায়াতুন্নবী। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

প্রিয় নবীর অনন্য জানাযা

আমাদের নবী করিম ﷺ এর ইন্তেকাল সাধারণ মানুষদের মত হয়নি বরং তার ইন্তেকালের পূর্বে হযরত জিব্রাইল (আ) নিজে এসেছিলেন তাঁর অনুমতি নিতে যে তিনি আর দুনিয়াতে থাকতে চান কিনা এমনকি আমাদের প্রিয়নবীর রূহ মোবারক তার অনুমতিক্রমে কবজ করা হয়। আরো লক্ষনীয় যে সাধারণত জানাযার নামায যেভাবে আদায় করা হয়ে থাকে, নবী করিম ﷺ এর সেই রকম কোন জানাযার নামাজ পড়া হয়নি। কেননা সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবীকে হায়াতুন্নবী মনে করতেন। মহানবীর সীরাতের সকল কিতাবেই উল্লেখ আছে যে, দশ-পনের জন করে পৃথক পৃথকভাবে হুযুর পাক এর পবিত্র দেহের সামনে হাজির হলেন এবং দরূদ ও সালাম পেশ করলেন।

প্রিয় নবীর স্ত্রীদের অন্য কারো সাথে নিকাহ হারাম

প্রত্যেক মুসলমানের মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের মধ্যে কুরআনের বিধান অনুযায়ী বণ্টন করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীর ইন্তেকালের পর তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি যদিও তাঁর

আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) তখনও জীবিত ছিলেন। তাছাড়াও প্রিয়নবীর সহধর্মীনীগণকে "উম্মাহাতুল মুমিনীন" অর্থাৎ সমস্ত মুমিনদের মা রূপে অভিহিত করা হল। এর ফলে তাদের নিকাহ অন্য কারো সাথে নিষিদ্ধ হল। কারণ কারো স্বামী জীবিত বা বর্তমান থাকলে তার স্ত্রী অন্য কারো সাথে বিয়ে করতে পারে না (যদি তালাক না হয়)। এবং আমাদের প্রিয়নবী তো কবরে জীবিত অবস্থায়, অক্ষত অবস্থায় বিরাজমান আছেন, তাই প্রিয়নবীর স্ত্রীরা অন্য কারো বিয়ের প্রশ্নই উঠে না। ইসলামে বিধবা বিয়ে জায়েয থাকলেও মহানবীর ইন্তেকালের পরও তার স্ত্রীদের বিয়ে নিষেধ হল। এটিই প্রমাণ করে যে আমাদের প্রিয়নবী হায়াতুন নবী এবং তিনি কবরে জীবিত অবস্থায় আছেন।

প্রিয় নবী তাঁর উদ্দেশ্যে প্রেরিত দরূদ ও সালাম এর জবাব দিচ্ছেন

আমরা প্রিয়নবীর প্রতি যে দরূদ ও সালাম পেশ করি মহানবী ﷺ তার জবাব দিয়ে থাকেন তার রওজা মোবারক থেকে। এ সম্বন্ধে একটি হাদীস এসেছে যে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন "কোন ব্যক্তি যখন আমার প্রতি সালাম পেশ করে আল্লাহ পাক আমার রূহ ফেরত দিয়ে দেন যাতে করে আমি সালামের জবাব প্রদান করতে পারি।" (সুনানে আবু দাউদ)

এখন এই হাদীসের আলোকে একটি গবেষণালব্ধ বা ইজতিহাদি বিষয় নির্ধারণ করা যায়। তার আগে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে প্রতি মুহূর্তে দুনিয়াতে কেউ না কেউ নামায পড়ছে। বরং দুনিয়াতে এমন একটি মুহূর্ত নেই যখন কেউ নামায পড়ছে না। প্রতিটি মুহূর্তে বিশ্বের প্রতিটি কোণে কেউ না কেউ নামায পড়ছে, কেউ রুকু করছে, কেউ তাশাহুদ পড়ছে, কেউ সিজদা করছে। সে হিসাবে প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ তাশাহুদের মাধ্যমে মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছে। সুতরাং আলোচ্য ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে প্রতি মুহূর্তে কেউ না কেউ প্রিয়নবীর প্রতি দরূদ সালাম পেশ করছে। তাহলে আলোচ্য হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি মহান আল্লাহ প্রিয়নবীকে প্রতি মুহূর্তে তার রূহ ফেরত দিচ্ছেন এবং প্রতি মুহূর্তে প্রিয়নবী ﷺ সেই সালামগুলোর জবাব দিচ্ছেন। যিনি প্রতি মুহূর্তে তার উম্মতের সালামের জবাব দিচ্ছেন তিনি কিভাবে প্রাণহীন, মৃত হতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি তার রওজা মোবারকে অক্ষত শরীরে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ জীবিত আছেন।

এখানে এতক্ষণ বিভিন্ন শরয়ী দলীল এর আলোচনা করা হল। এখন একটি আকলী দলীল দিয়ে পুরো বিষয়টি বুঝানো হবে।

একটি আকলী দলীল

মাটি মহান আল্লাহ পাকের এমন একটি সৃষ্টি যা যে কোনো জৈব পদার্থকে গলিয়ে পচিয়ে মাটি করে ফেলে। কিন্তু মনে রাখবেন, মাটি কখনো কোনো জীবন্ত বস্তু বা প্রাণীকে মাটিতে পরিণত করতে পারে না। যেমন মাটির মধ্যে অনেক জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া সহজেই বসবাস করে। শুধু তাই নয়, সাপ, খরগোশ, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীও মাটিতে গর্ত করে মাটির ভিতরে বসবাস করে। মাটি তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কারণ তাঁরা জীবন্ত। অন্যদিকে আমরা যখন কাউকে মাটিতে কবর দেই, তবে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর তাঁর শরীরের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, কারণ সে প্রাণহীন ও মৃত।

এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ। যিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক মাটিতে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। কারণ তিনি হায়াতুন্নবী।

ঈদে মিলাদুন্নবীর বিরোধিতাকারীরা এসব দলিল মেনে নবীকে জীবিত হিসেবে মেনে নিলেও তারা বলতে চায় যে ১২ই রবিউল আউয়ালে যদি প্রিয়নবীরআগমন হিসেবে আনন্দ ও খুশি করা হয় তবে তার ইন্তেকাল এর দুঃখ হিসেবে আমাদের শোক প্রকাশ করা উচিত।

যাদের মনে এরকম ধারণা আছে তাদের জেনে রাখা উচিত যে ইসলামে কেউ মারা গেলে বা কারো মৃত্যু হলে কোন শোকসভা বা শোক সমাবেশ করার হুকুম নেই। কিন্তু হাঁ কারো মৃত্যু হলে সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে তিনদিন পর্যন্ত শোক করার অনুমতি আছে। তাছাড়া কোন মানুষ মারা গেলে তার মত্যুর পর যে কুলখানি করা হয়, চেহলাম করা হয় বা মৃত্যুবার্ষিকী করা হয় তা কোন শোকের অনুষ্ঠান নয় বরং সেটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য মাগফেরাত চাওয়া। এজন্য যদি প্রিয়নবীর ইন্তেকালের জন্য দুঃখ বা শোক প্রকাশ করতে হয় তবে সেটার সময় ছিল তার ইন্তেকালের পর তিনদিন যা বহুকাল পূর্বেই শেষ গিয়েছে।

আসলে ইসলাম হচ্ছে আনন্দ ও খুশির ধর্ম যেখানে আনন্দ ও খুশির মাধ্যমে মহান আল্লাহর দরবারে তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। এজন্য কোন মুসলমানের ঘরে সন্তানের জন্ম হলে ইসলামে আকীকার হুকুম আছে। কিন্তু কারো মৃত্যু হলে কোন শোক সভার নিয়ম নেই। তাই এটি প্রমাণ করে যে ১২ই রবিউল আউয়াল যেদিন নবীর জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই হয়েছে সে দিন কেবল তার জন্মের আনন্দ বা খুশি প্রকাশ (শরীয়ত সম্মতভাবে) করা যাবে কোন শোকসভা করা ঠিক হবে না।

সাধারণত প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ যথাযথ আদব ও সম্মানের সাথে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করে থাকে। এটি আমাদের দেশের একটি নিয়ম হয়ে গেছে যে অধিকাংশ মানুষই যে কোন ইসলামী অনুষ্ঠানকে মিলাদ মাহফিল বলে থাকে। অনেকে এ বিষয় নিয়ে আপত্তি করে যে বছরের কোন একটি দিনকে কেন নির্দিষ্ট করে এ মিলাদ মাহফিল করা হয়। আসল কথা হচ্ছে বছরের যে কোন সময়ে যে কোন দিন মিলাদ মাহফিল করা যায়। যেমন আমাদের দেশে যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেমন শবে মেরাজ, শবে বরাত ও লাইলাতুল কদর সহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও মিলাদ মাহফিল করা হয়। তাছাড়া বছরের যে কোন একটি দিন বা দিবসকে নির্দিষ্ট করে মিলাদ মাহফিল করলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ এ সম্বন্ধে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে একাধিক হাদীস এসেছে যে নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে সোমবারের রোযা রাখতে উৎসাহিত করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে তিনি সপ্তাহের একটি দিনকে নির্দিষ্ট করে তাতে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তাই এই হাদীসগুলোর আলোকে এটি বলা যায় যে কোন নির্দিষ্ট দিনে মিলাদ মাহফিল করা জায়েয। তবে আমাদের উচিত কোন নির্দিষ্ট দিনে মিলাদ মাহফিল সীমাবদ্ধ না রেখে যে কোন আনন্দ বা খুশির বিষয় হলে মহান আল্লাহর কাছে তার নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ সব সময় মিলাদ মাহফিল করা।

প্রিয় নবীর প্রকৃত জন্ম তারিখ

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এই বিশ্বের বুকে যে বছর আগমন করেছিলেন সেটা ছিল আমুল ফিল (হস্তীর বছর) প্রিয়নবীর জন্মের প্রায় ৪০ দিন আগে আবরাহার হস্তী বাহিনীকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন। যে মাসে জন্ম হয় সেটা রবিউল আউয়াল, যে দিনে জন্ম লাভ করেন সেটা সোমবার, যে সময়ে জন্ম হয় সেটা সুবহে সাদিক। এইসব তথ্যই প্রিয়নবীর জন্মসংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভুল। তবে তাঁর প্রকৃত জন্মতারিখ নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

কোন কোন সীরাতবিদ বলেন যে, প্রিয়নবীর জন্ম রবিউল আউয়ালের ২ তারিখে, কেউ বলেন ৭ তারিখে, কেউ বলেন ৯ তারিখে, কারও মতে ১১ তারিখে আবার কারো মতে ১২ তারিখ। অন্যদিকে শিয়াদের মতে ১৭ তারিখে। এখানে বর্ণিত তারিখসমূহের মধ্যে সবচেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ তারিখ হচ্ছে ১২ রবিউল আউয়াল। তার কারণ হলো–

◈ বিশ্ববিখ্যাত সীরাতবিদ আবু মুহাম্মদ মালেক ইবনে হিশাম (রহ.) তাঁর রচিত **"সীরাত ইবনে হিশামে"** প্রিয়নবীর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল উল্লেখ করেছেন।

◈ তাঁর সীরাত ইবনে হিশাম কে ধরা হয় বিশ্বনবীর জীবনী সম্পর্কিত প্রথম সার্থক রচনা। এটি ২০০ হিজরী সনের দিকে অর্থাৎ প্রিয়নবীর ওফাতের প্রায় ১৯০ বছর পর রচনা করা হয়। মূলত এর রচয়িতা তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁর উস্তাদ ইবনে ইসহাকের রচিত "সীরাত ইবনে ইসহাক" থেকে। যিনি নবীজীর জীবনের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন স্বয়ং তাবেঈনদের নিকট থেকে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে সমস্ত সীরাতবিদ সীরাত ইবনে হিশামকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গণ্য করেন।

◈ যেহেতু সীরাত ইবনে হিশামের রচয়িতার কিতাবের তথ্য-উপাত্ত তাঁর উস্তাদ ও বিভিন্ন তাবেঈনদের নিকট থেকে গৃহীত এজন্য এর গ্রহণযোগ্যতা অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে বেশী।

◈ প্রিয়নবীর জীবনী বিষয়ক যত গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে বা যত বিশ্বকোষে প্রিয়নবীর জীবনী রয়েছে অধিকাংশ স্থানে ১২ রবিউল আউয়াল ধরা হয় প্রিয়নবীর জন্ম তারিখ।

এইজন্য অধিকাংশ উলামায়ে কেরামসহ বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই ১২ রবিউল আউয়ালে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপিত হয়।

মহানবীর প্রকৃত জন্ম তারিখ মহান আল্লাহই ভালো জানেন, তবে আমাদের একটি কথা জেনে রাখা উচিত যে বছরের যে কোন দিন নবীর আগমনের খুশিতে মিলাদ মাহফিল করা যাবে। প্রিয় নবীর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের ২,৩,৭,৯ তারিখে হয়েছে না ১২ তারিখে তা আসল বিষয় নয়, মূল বিষয় হচ্ছে মহানবীর জন্মের খুশিতে মিলাদ করা যা সারা বছরের যে কোন দিন করা যাবে। নবী করিম ﷺ এর পরিপূর্ণ ভালবাসার সাথে বৎসরের যে কোন দিনে মিলাদ মাহফিল করলে মহান আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করবেন।

رب سلم على رسول الله   مرحبا مرحبا رسول الله

৩য় আপত্তি

সৌদি আরবে মিলাদ মাহফিল বা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা হয় না, তাই মিলাদ মাহফিল করা ঠিক নয়।

জবাব ঃ এটা একটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দুনিয়াবী সব বিষয়ে আমরা পশ্চিমা বিশ্বের অনুকরণ করি এবং ধর্মীয় যাবতীয় বিষয়ে আমরা আরবদের মত করে চলার চেষ্টা করি। পবিত্র কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং আমাদের ধর্মের পবিত্র স্থানগুলো যেমন কাবা শরীফ, নবীজির রওজা মোবারক, মাকামে ইব্রাহিম, জমজম কূপ ইত্যাদি সব কিছুই সৌদি আরবে আছে। তাই

আমাদের অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই সৌদি আরবের জন্য সম্মান ও ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে সৌদি আরব হচ্ছে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর নেতা বা ইসলামের নীতি নির্ধারক। পবিত্র কুরআনে কিংবা হাদীসে কোথাও এরকম নেই যে, মুসলমানদের নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র যেমন- আরব বা অনারবদের অনুসরণ করতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সর্বত্রই মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মহান আল্লাহ ও তার নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করতে, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী, রাষ্ট্র বা জাতির নয়।

আমাদের সমাজে অনেক ব্যক্তি এমন আছে যারা মনে করে যে, বর্তমানে সৌদী আরব যা করে সেটাই ইসলাম, এর বাইরে আর কিছুই নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। দুঃখের সাথে এবং অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হয়, সৌদী আরবেও এমন কিছু কার্যক্রম হয় যা কোনো ভাবেই ইসলাম সমর্থিত নয়।

সৌদী আরবের শাসন ব্যবস্থা ইসলামের বিধান খিলাফতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং পরিবারতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাদশাহর পর তাঁর ছেলে হবে রাজা এটাই সৌদী রীতি, যা ইসলামসম্মত নয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগে কোনো খলিফাই নিজের ছেলেকে খলিফা বা খলিফা বানানোর নির্দেশ দেন নি। কারণ খেলাফতের শর্ত হচ্ছে একজন ব্যক্তির বংশ পরিচয় নয়, বরং তার ঈমান ও আমলের যোগ্যতা।

আল্লাহর ঘর, প্রিয়নবীর রওজা সবই সৌদী আরবে অবস্থিত। তাই সৌদী আরবের উচিত ছিল সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশসমূহের প্রধানরূপে নিজ দায়িত্ব পালন করা। কিন্তু তারা এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। বিশেষ করে ৯/১১ টুইন টাওয়ার হামলার পর যখন মার্কিন বাহিনী জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইরাক ও আফগানিস্তান এই দুটি মুসলিম দেশের উপর যেরূপ তাণ্ডব চালিয়েছে তখন বিশ্বের সব মুসলিম দেশ প্রতিবাদমুখর থাকলেও সৌদী শাসকরা ছিল নীরব। এমনকি বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের নাগরিকরাও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বিভিন্ন প্রতিবাদ, সভা-সমাবেশ করে। অন্যদিকে সৌদী আরবের শাসকবর্গ প্রতিবাদ তো দূরে থাক তারা মার্কিনীদের সাথে নিজ বন্ধুত্ব বাড়াতে ব্যস্ত।

এছাড়াও বর্তমান শাসকবর্গের উচ্চাভিলাষী জীবন যাপন সমগ্রবিশ্বে ব্যাপকভাবে সমালোচিত। মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে তেল খনির মতো অমূল্য সম্পদ দান করেছেন। তাঁদের উচিত ছিল এই সম্পদগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে মুসলিম দেশ যেমন ফিলিস্তিন, কাশ্মীর এদের সাহায্য করা ও কাফিরদের বিভিন্ন অত্যাচারের প্রতিবাদ করা। অথচ এরা ব্যস্ত আছে ভোগ বিলাসে। বর্তমান সৌদী শাসকরা যে পরিমাণ অর্থে শাসন করেন তারচেয়েও

বিরাট পরিমাণ অঞ্চল করেছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)। অথচ তিনি তালিযুক্ত জামা পরতেন। মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে মদীনা থেকে জেরুজালেম যাত্রা করেন যার অর্ধেক পথে নিজ গোলামকে উটে বসান। তিনি তাঁর খেলাফতের কাজের সময় যখন বিশ্রাম নিয়ে আহার করতেন সেখানকার কুপির আলো নিভিয়ে ফেলতেন। কারণ তিনি বলতেন এই কুপির তেল জনগণের সেবার জন্য, আমার খানা খাওয়ার জন্য নয়। সুবহানাল্লাহ। তাই জেনে নিন ইসলামের মানদণ্ড কুর'আন ও হাদীস, সৌদী আরব নয়।

আমাদের প্রিয়নবী হযরত হাম্মদ ﷺ তাঁর বিদায়ী হজ্জের মূল্যবান ভাষণে একটি কথা বলেছিলেন যে, "আরবদের উপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, অনারবদের উপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।" নবীজির এই বাক্য প্রমাণ করে যে আরব অনারব উভয়ই সমান। তাছাড়া আমাদের আরেকটি জিনিস জেনে রাখা উচিত যে সৌদি আরব ইসলামের মানদণ্ড নয়, বরং কুরআন ও হাদীস হচ্ছে ইসলামের মানদণ্ড। এটি একটি দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে সৌদী আরবে ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল রাষ্ট্রীয়ভাবে উদযাপিত হয় না। অথচ আমরা যদি মাত্র ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফিরে যাই তবে যখন সৌদি আরব রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনও সেখানে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপিত হত।

শুধু তাই নয়, বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঈদে মিলাদুন্নবী এর সময়ে যে জাশনে জৌলুস বা মিছিল বের হয় সেটা ১৯২০ সালের পূর্বে আল-সউদ পরিবারের মক্কা-মদীনার কর্তৃত্ব গ্রহণের পূর্বেও অনুষ্ঠিত হত। সে সময়কার রাষ্ট্রপ্রধানরাও এই মিছিলে শরীক হতেন যেটা প্রিয়নবীর জন্মস্থান সহ বিভিন্ন স্থানে প্রদক্ষিণ করত। শত শত বছর ধরে তাঁরা উক্ত জশনে জৌলুস করত। কিন্তু আফসোস, বর্তমান শাসকদের ভিন্ন আকিদা থাকায় তাঁরা এই সমস্ত মাহফিলকে প্রকাশে নিষিদ্ধ করেছে।

এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার যে তারা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর বিশ্বের বুকে আগমনের দিন তথা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে না অথচ প্রতি ইংরেজী বছর ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে তারা বেশ জাঁকজমকভাবে তাদের জাতীয় দিবস তথা সৌদী আরব এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে।

বর্তমান বিশ্বে এখনো সৌদি আরব ও তার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যতীত সকল আরব বিশ্ব যেমন মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, জর্দান, মরক্কো, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইয়ামেন, সুদান, লিবিয়া, তুর্কী, ইরান ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত হয়।

তাছাড়া এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সহ বিশ্বের সকল মুসলিম দেশে (হাতে গোনা কয়েকটি ব্যতীত) যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সহিত ও ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা হয়। অথ্যাৎ অধিকাংশ মুসলমানই মিলাদ মাহফিল ও ঈদে মিলাদুন্নবীকে সঠিক মনে করে এবং উদযাপন করে। উম্মতের এ রকম একমত হবার সম্বন্ধে আমাদের নবীজী বলেছেন– "আমার উম্মত কখনো ভ্রান্ত মতবাদের উপর একমত হবে না।" (সুনানে আবু দাউদ)

হযরত নবী করিম ﷺ এর এই হাদীসই ঈদে মিলাদুন্নবী সঠিকতা প্রমাণ করে। কারণ ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল বৈধ জায়েয ও মুস্তাহাব হবার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীর আলেমগণ ইজমা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তবে অবশ্য সৌদী সরকার প্রতি বছর লাখ লাখ হাজী যারা হজ্জ পালন করতে যায় তাদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করছে। মুসলমান হিসেবে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আসলে সৌদী আরবের সাথে আমাদের মনের আবেগ জড়িত আছে, তাই আশা করি সৌদী আরব এই সকল বিষয়ে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এবং ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিল নিয়ে তাদের মধ্যে বা তাদের অনুসারীদের মধ্যে যে ভুল ধারণা আছে সেটা দূর হবে। (আমীন)

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

৪র্থ আপত্তি

ঈদে মিলাদুন্নবী এটি হচ্ছে খৃষ্টানদের বড় দিনের ন্যায়। তাই খৃষ্টানদের অনুকরণ করা যাবে না।

জবাব ঃ মিলাদ মাহফিলের এবং ঈদে মিলাদুন্নবী এর বিরোধিতাকারীরা সব সময় এ সকল অনুষ্ঠানের বিরোধিতাকরে বলে যে এগুলো হচ্ছে খৃষ্টানদের অনুকরণ, তারা যেভাবে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের দিনকে বড়দিন হিসেবে উদযাপন করে আমরা সে রকম করে নবী করিম ﷺ এর আগমনের দিনকে ঈদে মিলাদুন্নবী হিসেবে উদাপন করি (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের এই খোঁড়া যুক্তির এখন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে খণ্ডন করা হবে।

আমাদের প্রিয়নবী আমাদেরকে অন্য ধর্মালম্বীদের এক ধরনের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন সেটি হচ্ছে অন্ধ অনুকরণ। অর্থাৎ কোন মুসলমানকে হুবহু সেই রকম কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা অন্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় কাজ হিসেবে করে থাকে। এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস আছে যা বুখারী, মুসলিম শরীফ, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি প্রখ্যাত হাদীসের বইগুলোতে এসেছে। সেই হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে আমাদের নবী করিম ﷺ প্রতি বছর আশুরার রোযা (১০ই মহররম) রাখতেন। তিনি যখন মদীনায় হিজরত করে গেলেন তখন জানতে পারলেন যে সেই দিন ইহুদীরাও রোযা রাখত কারণ

সেই দিন আল্লাহ হযরত মুসা (আ) ও তার সঙ্গীদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেন ও ফেরাউন এবং তার সৈন্য সামন্তকে নীল নদে নিমজ্জিত করেন, তারা এই জন্য শুকরিয়া এরূপ রোযা রাখত। আমাদের মহানবী ﷺ যখন এটা জানতে পারলেন তখন তিনি আশুরার রোযার সাথে আরেকটি রোযা একদিন আগে বা পরে মিলিয়ে রাখার নির্দেশ দেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের মহানবী ﷺ আশুরার রোযা পরিত্যাগ করেননি বরং সেটাকে আরো একটি রোযার সাথে মিলিয়ে রাখতে বলেছেন। যাতে তা ইহুদীদের হুবহু অনুরূপ বা অনুকরণ না হয়। এক্ষেত্রে আমাদের প্রিয়নবীর হুবহু অনুকরণ পরিহার করে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে আশুরার রোযা রেখেছেন। এভাবেই কোন ব্যক্তি যদি মুসলমানদের ঈদে মিলাদুন্নবী ও খ্রিষ্টানদের বড়দিনের পার্থক্য না বুঝে তবে সেও মিলাদ বিরোধীদের ফাঁদে পড়বে এবং ঈদে মিলাদুন্নবীকে খৃষ্টানদের অনুকরণ করবে।

অন্য সম্প্রদায়ের অনুকরণ সম্বন্ধে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন,

عَنْ بِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ۝ (احمد، ابو داود)

অর্থ : হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি যার অনুকরন করবে তাকে তাদের মধ্যেই ধরা হবে। (আহমাদ, আবু দাউদ)

এখানে تَشَبَّهَ অর্থাৎ অনুকরণ হচ্ছে এমন জিনিস যেটা করার ফলে কোন মানুষ কোন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের এটা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যায়। অর্থাৎ এমন কোন অমুসলিমের আমল বা কাজ যা যদি কোনো মুলমান করে তবে তার ও সেই অমুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকা।

যেমন কোন মুসলিম যদি গলায় ক্রুশ পরিধান করে (নাউযুবিল্লাহ) তবে সেটা হবে تَشَبَّهَ এর অন্তর্গত। কেননা তখন সে আর মুসলমানদের মতো নয়, বরং নাসারা খ্রিস্টানদের মতো মনে হবে। আবার যদি কোন মুসলমান তার কপালে হিন্দুদের ন্যায় সিঁদুরের তিলক দেয় অথবা শিখদের মতো তাদের ধর্মীয় পাগড়ী পরে তবে সেটাও تَشَبَّهَ এর অন্তর্গত হয়ে যাবে। কারণ মাথায় সিঁদুর ও শিখদের পাগড়ী সারা দুনিয়াতে হিন্দু ও শিখদের পোশাক হিসেবে স্বীকৃত। এই সমস্ত আমলের ক্ষেত্রে প্রিয়নবী সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ এটা মানুষকে কুফর এমনকি শিরকের অবস্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়।

অন্যদিকে কোট, প্যান্ট, টাই পরিধান করা تَشَبَّهَ এর অন্তর্গত হবে না, কারণ এটা এমন Universel dress যেটা সারা দুনিয়ার মানুষ পরিধান করে, কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। যদিও এগুলো অনুকরণ পছন্দনীয় নয় তবে পরা হারাম নয় বরং জায়েয (ক্ষেত্রবিশেষে মুবাহ) এবং এগুলো এই হাদীসে বর্ণিত অনুকরণের মতো নয়।

পরিশেষে বলতে চাই, এমন অনুকরণ করা, যেটা করার ফলে কোন মুসলমানের নিজস্ব পরিচয় মুছে যায় এবং তার ব্যক্তিসত্তা অন্য কোন ধর্মের পরিচয় বহন করা এমন যাবতীয় অনুকরণ এই বর্ণিত হাদীসের تَشَبَّهَ এর অন্তর্গত এবং এটা হারাম।

অন্যদিকে ঈদে মিলাদুন্নবী কে কেন্দ্র করে অথবা যেকোন মিলাদ মাহফিলে যে সমস্ত কাজ করা হয় যেমন কুরআন তেলাওয়াত, হামদ, নাতে রাসূল, কিয়াম এগুলো কোনটিই অন্য কোনো ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর অনুকরণ নয় বরং সম্পূর্ণ মুসলমানদের নিজস্ব ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূণ একটি অনুষ্ঠান। তাই ঈদে মিলাদুন্নবী বা মিলাদ মাহফিলের মতো নূরানী অনুষ্ঠানকে যারা অন্যদের অনুকরণ বলে এটি তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এতকিছু আলোচনার পর আশা করি এই প্রশ্নের জবাবও যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে। তারপরও আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য এখন ঈদে মিলাদুন্নবী ও খ্রিস্টানদের বড় দিনকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা হবে।

ঈদে মিলাদুন্নবী ও খ্রিষ্টানদের বড়দিনের মধ্যে অসংখ্য বাহ্যিক পার্থক্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো ঈদে মিলাদুন্নবী স্বতন্ত্রতা দান করেছে ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে। এগুলো হল-

➢ খৃষ্টানেরা বড়দিন বা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের খুশি বছরে কেবল একবার (২৫ শে ডিসেম্বর) করে থাকেন।

➲ মুসলমানেরা বছরে যতবার এই খুশির দিন (সোমবার) আসে ততবার ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করতে পারেন।

➢ খৃষ্টানেরা একটি নির্দিষ্ট দিনে অর্থ্যাৎ ২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিন পালন করে।

➲ মুসলমানেরা বছরের যে কোন দিন মহানবীর আগমনের খুশিতে মিলাদ মাহফিল করতে পারে।

➢ খৃষ্টানেরা সেই দিন গির্জা ঘরে গিয়ে হযরত মারইয়াম (আ) ও হরত ঈসা (আঃ) এর মূর্তির সামনে (মাতা মেরী ও যীশু খ্রীষ্টের) গিয়ে প্রার্থনা করে যা

ইসলামের শরীয়ত বিরোধী এবং ইসলামের দৃষ্টিতে শিরকের মতো একটি বড় গুনাহ।

➲ মুসলমানেরা ঈদে মিলাদুন্নবী এর দিনে মিলাদ মাহফিল করে যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা করা হয় এবং মহানবীর জন্ম, কর্ম তথা তাঁর সামগ্রিক সীরাত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয় এবং এ থেকে দৈনন্দিন জীবনে নবীর সুন্নাহর আলোকে চলার শিক্ষা নেয়া হয়।

এই কয়েকটি প্রধান পার্থক্যই যথেষ্ট এটি প্রমাণ করার জন্য যে ঈদে মিলাদুন্নবী কোন অনুকরণের কাজ নয় বরং ইসলামী শরীয়ত সমর্থিত একটি স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত অনুষ্ঠান। তারপরও এই দুটো অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি বিরাট উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বিদ্যমান। সেটা হচ্ছে খৃষ্টানেরা তাদের বড়দিন করে কেবল আনন্দ ও ফুর্তির জন্য, অপর দিকে ঈদে মিলাদুন্নবী হচ্ছে এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে শরীয়ত সম্মতভাবে মহানবীর আগমনের খুশি ও আনন্দ পালন করা হয়, তার পাশাপাশি প্রিয়নবীর জীবনকে নিজের জীবনের আদর্শ হিসেবে নেয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা হয়।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ   مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

৫ম আপত্তি

ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে যা কিছু খরচ হয় এগুলো কেবল অপচয়, ইসলামে অপচয়ের কোন সুযোগ নেই।

জবাব ঃ ঈদে মিলাদুন্নবী এর মত একটি পবিত্র অনুষ্ঠানকে অপচয় বলা একান্তই বোকামী কারণ আমাদের প্রিয়নবী ﷺ এর পবিত্র জীবনী এতে আলোচনা করা হয় এবং তাতে আমাদের জন্য অসংখ্য শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে। তাই এ সকল অনুষ্ঠানের পিছনে অর্থ খরচ করা কোন অপচয় নয় বরং এক ধরনের বিনিয়োগ। মহান আলাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

(سورة يونس –٥٨)

অর্থ ঃ হে নবী বলো, এ জিনিসটি যে তিনি তাদের পাঠিয়েছেন এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার মেহেরবাণী। এজন্য তা লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করেছে সে সবের চেয়ে এটা অনেক ভাল।

(সূরা ইউনুস : ৫৮)

এ সকল অনুষ্ঠানে নবীর জন্ম ও জীবনী সর্ম্পকিত যে আলোচনা হয় তা যদি সেখানে উপস্থিত অনন্ত একজন ব্যক্তির মনকে অনুপ্রাণিত করে এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি মহান আল্লাহ তাকে হেদায়াত দেন তবে সে যেমন একজন সার্থক মুসলমান হবে, তেমনি ইসলামের উন্নতির জন্য আরো বহুবিধ অবদান রাখতে পারবে।

তবে আমাদেরকে এ সকল মিলাদ মাহফিলের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ সকল অনুষ্ঠানে যে সকল খরচ হয় যেমন মাইক ভাড়া, আলোকসজ্জা, তাবারুক বিতরণ এ সকল ক্ষেত্রে সব রকমের বাহুল্য খরচ পরিহার করতে হবে কারণ ইসলামে অপচয়ের কোন সুযোগ নেই।

তাই যদি আমরা বাহুল্য খরচ পরিহার করে শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে মিলাদ মাহফিলের পিছনে নিজের মূল্যবান অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করি তবে তা কোন অপচয় হবে না বরং আল্লাহর পথে এবং ইসলামকে আরো সুন্দর, প্রসারিত ও সমৃদ্ধশীল করার লক্ষ্যে তা হবে একটি উত্তম বিনিয়োগ।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এতক্ষণ যে মিলাদ মাহফিলের প্রতি আপত্তিমূলক প্রশ্নের জবাব দেয়া হল তার উদ্দেশ্য এই নয় যে কাউকে কষ্ট দেয়া বা কাউকে অপমানিত করা। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে মিলাদ মাহফিল ও ঈদে মিলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে আমাদের মাঝে অর্থাৎ মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা এবং মুসলমান মুসলমান পুনরায় নিজেদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা।

তাছাড়া বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের যে দুর্গতি হচ্ছে তার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরী করে ফেলেছি। ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হলে আমাদের উচিত নিজেদের মধ্য থেকে যাবতীয় বিভাজন দূর করে এক আল্লাহর নির্দেশ মান্য, অন্তরে নবী প্রেম জাগ্রত করা এবং নবীর জীবনকে নিজের আদর্শ হিসেবে মানা। ঈদে মিলাদুন্নবী ও মিলাদ মাহফিল মানুষের অন্তরে নবীপ্রেম ও তার জীবনকে নিজের আদর্শ রূপে মানতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তাই আমাদের উচিত নিজেদের মধ্যে যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝি দূর করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও শরীয়তসম্মতভাবে মিলাদ মাহফিল পালন করা অন্তরে মহানবীর প্রতি মুহাব্বত জাগ্রত করা ও নিজেদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা, তবেই আমরা মুসলমানেরা নিজেদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হব।

رَبِّ سَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ حَبِيبِنَا رَسُولِ اللهِ

ফিৎনা থেকে বাঁচার উপায়

ঈদে মিলাদুন্নবী এবং মিলাদ ও মাহফিল পালন ও উদযাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয এবং মুস্তাহাব ও মুস্তাহসান। তবে এটি পালন করা বাধ্যতামূলক নয় এবং মিলাদ মাহফিল না করলে যে গুনাহ হবে তা নয়। আমাদের দেশে মিলাদ মাহফিল নিয়ে ও তার বিষয়বস্তু নিয়ে কোন মতভেদ না থাকলেও যে বিষয় বির্তকের সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে কিয়ামকে কেন্দ্র করে। অনেকে কেবল বসে মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে আবার অনেকে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করে।

আমাদেরকে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে কিয়ামকে কেন্দ্র করে অযথা নিজেদের মধ্যে কোনোরূপ ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা উচিত নয়। যদি মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে কিয়ামের সময় কেউ বসে থাকে তবে তাকে দাঁড়াতে জোর করা উচিত নয়, আবার কেউ কিয়ামের সময় দাঁড়িয়ে গেলেও জোর করে বসানো ঠিক ন। আমাদেরকে এ বিষয় নিয়ে অযথা বিতর্ক করা উচিত নয়।

মূলকথা হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে ফিতনা রোধ করা। যদি কোন স্থানে মিলাদ মাহফিলে কিয়াম না করা হয় তবে সেখানে বসে থাকাই উত্তম। এবং যারা মিলাদ মাহফিলের বিরোধিতা করে বা কিয়ামের বিরোধীতা করে আমাদের তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা উচিত নয়। আমাদের মনে করা উচিত যে তাদের কাছে এ বিষয়ের জায়েয হবার দলীল প্রমাণ পৌছেনি। তাছাড়া এ বিষয়গুলো নিয়ে তাদের সাথে তর্ক বা জোর জবরদস্তি করা উচিত নয়। কারণ কুরআন শরীফে মহান আল্লাহ বলেছেন–

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ-(سورة البقرة ٢٥٥)

অর্থ ঃ দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। (সূরা আল বাকারা- ২৫৬)

মহান আল্লাহ যদি তাদেরকে হেদায়াত দান করেন, তবে মিলাদ বিরোধীরা অবশ্যই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং তারাও সঠিকভাবে মিলাদ পালন করবে।

তাই আমাদের মুসলমানদের উচিত নিজেদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মত এক হয়ে চলা। তবেই মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবার বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে এবং পৃথিবীকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম হবে।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ　　مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللهِ

পঞ্চম অধ্যায়

মিলাদ মাহফিল ও কিয়ামের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

আলহামদুলিল্লাহ, এতক্ষণ আপনাদের সামনে মিলাদ মাহফিলের বৈধতা ও জায়েয হবার দলিল তুলে ধরা হল। তাই এখন আলোচ্য বইয়ে সংক্ষিপ্তভাবে মিলাদ মাহফিল ও কিয়াম লিপিবদ্ধ করা হল যাতে পাঠকবৃন্দ অল্প সময়ের মহানবী এর গুণগান আলোচনা করে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হতে পারেন। প্রথমেই পবিত্র কুরআন থেকে কিছু তেলাওয়াত, তারপর হামদ–বারী তাআলা; নাতে রাসূল পেশ করা তাওয়ালল্লুদ শরীফ পাঠ করা এবং তারপর বসে ও দাঁড়িয়ে কাসীদার মাধ্যমে মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত ও দোআ করবেন। মিলাদ মাহফিলের কোন নির্ধারিত নিয়ম নেই, তবে বুযুর্গানে দ্বীন বিভিন্নভাবে মিলাদ মাহফিল করে থাকেন। আমিও তাদের অনুসরণ করে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। মিলাদ মাহফিল যেখানেই হোক অযু করে পবিত্র অবস্থায় যাবেন এবং সামর্থ্য মত খুশবু ও আতর লাগিয়ে যাবেন।

কুরআনের বাণী

إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহপাক ও তাঁর ফেরেশতাগণসহ নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম (রহমত) বর্ষণ করছেন। অতএব হে ঈমানদারগণ, তোমরাও নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করো।

হাদীসের আলো

ايضا كُنتُ نبيًّا وَّ اٰدمُ بَيْنَ الرُّو حِ وَ الْجَسَدِ

আমি (মহানবী) তখন থেকে নবী ছিলাম যখন আদম (আ) কেবল রূহ ও শরীরের মধ্যস্থলে বিদ্যমান ছিল।

শানে মুস্তাফা

دہر میں تو سب سے بڑا　　تجھ سے بڑی خدا کی ذات

بھیج رہا خدا بھی تجھ پہ درود اور سلام

সৃষ্টির মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আল্লাহপাক এর সত্তা

সেই আল্লাহপাক ও আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছেন

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿سورة التوبة ١٢٨﴾

উচ্চারণ ঃ লাক্বাদ জা-আকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আযীযুন আলাইহিমা-আনিত্‌তুম হারীছুন আলাইকুম বিলমু'মিনীনা রাউফুর রাহীম। ফাইন তাওয়াল্‌লাও ফাকুল হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্‌কালতু ওয়া হুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থ : তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তরা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আলাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তারই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।(সূরা তাওবা : ১২৮-১২৯)

إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারিবুম মিনাল মুহসিনীন। ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন। মা-কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিররিজালিকুম ওয়া লাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্ নাবিয়্যীন, ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন আলীমা। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালা-য়িকাতাহু ইউছাল্‌লূনা আলান নাবিয়্যি, ইয়া-আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ ছাল্লূ আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা।

হামদ বারী- তায়ালা

کرتا ہوں پڑ کر بسم اللہ

কারতা হুঁ পাড়কার বিসমিল্লাহ

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ۩ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ۩ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

مالک تیرا حمد و ثنا

মালিক তেঁরা হামদো সানা

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ۩ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ۩ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

تو مالک میں بندا تیرا

তু মালিক মে বান্দা তেরা

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ۩ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ ۩ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

یونس کو ماہ سے بچایا نوح کا کشتی پار لگایا

میری بھی کشتی پار لگا

ইউনুসকো মাহীসে বাঁচায়া, নুহকা কাশতী পারলাগায়া

মেরী ভি কাশতী পার লাগা।

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ۩ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ✪ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۩ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

লা ইলাহা ইলল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ আমার রব এই রবই আমার সব

মতিউর রহমান মল্লিক

আল্লাহ আমার রব এই রবই আমার সব
দমে দমে তনুমনে তাঁরই অনুভব
তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই
অথৈ নেয়ামতে ডুবে আছে সবাই
পাখ পাখালির গানে শুনে তাসবীহ কলরব।।
আকাশে সুনীল এই ধরনীর সবুজে
অবুঝ এই হৃদয়ে আছোগো লুকিয়ে
তোমার মদদ পেলে আমি আর না কিছু চাই
তোমার প্রেমের অনল আমি কি দিয়ে নিভাই
যার হয়েছ তুমি তার নেই কোন ভয়।।
আল্লাহ আমার রব এই রবই আমার সব
দমে দমে তনুমনে তাঁরই অনুভব।।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللّٰهِ

قصيدة البردة المباركة كاملة

للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري

مَوْلَایَ صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ

نَبِيُّنَا الْآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ أَبَرُّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحَمِ

دَعَا إِلَى اللهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْفَصِمِ

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكَرَمِ

مَوْلَایَ صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

কাসীদায়ে বুরদা

--হযরত শেখ আবু আব্দুল্লাহ শরফুদ্দীন বুশাইরী (রহ.)

মাওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়ীমান আবাদান
আলা হাবীবীকা খাইরিল খালকি কুল্লিহিমি

মুহাম্মাদুন সাইয়্যেদুল কাওনাইনি ওয়াস সাকালাইন
ওয়াল ফারিকাইনি মিন আরাবীঁও ওয়ামিন আজামিন

নাবীয়্যূনাল আমীরুন নাহী ফালা আহাদুন
আ-বাররা ফি কাওলীল লা মিনহু ওলা নাআমী

হুয়াল হাবী-বুল্লাজি তুরজা শাফায়াতুহু
লিকুল্লি হাউলি-লিম্মিনাল আহওয়ালী মুখতা হিমী

দাআ ইলাল্লাহি ফাল মুসতামসিকুনা-বিহী
মুসতামসিকুনা-বিহাবলীল গাইরি মুনফাসিমি

ফা-খাননাবীয় ইয়না ফি খালকীও ওয়া ফি খুলুকিঁ
ওয়া লাম ইয়দা নুহু ফি ইলমাও ওয়াল কারামী

ফা-ইন্না ফাদ্বলা রাসূলিল্লাহী লাইঁসা লাহু হাদ্দুনঁ
ফা-ইউরিবু আনহু নাতি কুম বিফামি

সুম্মা-রিদা আন আবী বাকর ওয়া আন উমরঁ
ওয়া আন আলী আন উসমানা যিল-কারামী

মাওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়ীমান আবাদান
আলা হাবীবীকা খাইরিল খালকি কুল্লিহিমি

رب سلم على رسول الله

مرحبا مرحبا رسول الله

না'তে রাসূল

اصبح بدا من طلعته

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

اَلصُّبْحُ بَدَا مِنْ طَلْعَتِهِ
আস্‌সুবহু বাদামিন ত্বালাআতিহী

وَاللَّيْلُ دَجَى مِنْ وَفْرَتِهِ
ওয়াল লাইলু দুজা মিন ওয়াফরাতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

فَاقَ رَسُوْلُ فَضْلاً وَعُلَى
ফা-ক্বার রাসূলা ফাদ্বলাও ওয়া উলা

اَهْدَى السُّبُلُ لِدَلَالَتِهِ
আহদাছ ছুবুলা লি দালালাতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

نَالَ الشَّرَفَ وَاللّٰهُ عَفَا
নালাশ শারাফা ওয়াল্লাহু আফা

عَمَّا سَلَفْ مِنْ اُمَّتِهِ
আম্মা-ছালফা মিন উম্মাতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

سَعَتِ الشَّجَرُ نَطَقَ الْحَجَرُ
"ছা-আতিশ শাজারু নাত্বাকাল হাজার

شَقَّ الْقَمَرُ بِاِشَارَتِهِ
শাক্কাল ক্বামারু-বি-ইশারাতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

كَنْزُ الْكَرَمِ مَوْلَى النِّعَمِ — কানজুল কারামী মাওলান নেয়ামী

هَادِي الْأُمَمِ لِشَرِيْعَتِهِ — হাদিউল উমামী লিশারিয়াতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

أَزْكَى النَّسَبِ عَلَى الْحَسَبِ — আজকান নাছাবী আলাল হাছাবী

كُلُّ الْعَرَبِ فِي خِدْمَتِهِ — কুললুল আরাবী ফী খিদমাতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

جِبْرُ أَتَى لَيْلَةَ أَسْرٰى — জিবরীলু আতা লাইলাতা আছরা

وَرَبٌّ دَعَا لِلْحَضْرَتِهِ — ওয়া রাব্বু-দাআ লিল হাদ্বরাতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا — ফা মুহাম্মাদুনা হুওয়া সাইয়্যেদুনা

فَالْعِزُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ — ফাল ইজ্জুলানা লি-ইজা-বাতিহী

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللّٰهِ

নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি

কাজী নজরুল ইসলাম

নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন, সেইতো দু'জাহানের ধনী।
যে নামে মধু মাখা, সে নামে যাদু রাখা
সে নামে মজনু হইল, মাওলা আমার কাদের গনী।
নবী মোর নূরে খোদা, তাঁর তরে সকল পয়দা
আদমের কলবেতে, তাঁরই নূরের রওশনী।
ঐ নামে সুর ধরিয়া, পাখী যায় গান করিয়া
ঐ নামে আকুল হয়ে, ফুল ফুটে সোনার বরণী।
চানসুরুজ গ্রহ তারা, তাঁরই নূরের ইশারা
নইলে যে অন্ধকারে ডুবিত এই ধরণী।
নিদানে আখেরাতে, তড়াইতে পুলসেরাতে
কাণ্ডারী হইয়া নবী, পার করিবেন সেই তরণী।

তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে

কাজী নজরুল ইসলাম

তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে
যেন উষার কোলে রাঙা রবি দোলে ॥
কুল মাখলুকে আজ ধ্বনি ওঠে "কে এলো
কালেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে "কে এলো
খোদার জ্যোতি পেশানীতে ফোটে "কে এলো
পড়ে দরূদ ফেরেশতা বেহেশ্‌তে সব দুয়ার খুলে
মানুষে মানুষের অধিখার দিলে যে জন

এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন
মানুষের লাগি চির দীনহীন বেশ ধরিল যে জন
বাদশাহ-ফকিরে এক শামিল করিল যে জন
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
(আজ) মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোলে ॥

ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়

কাজী নজরুল ইসলাম

ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় ॥
ধূলির ধরা বেহেশতে আজ । জয় করিল, দিল রে লাজ
আজকে খুশীর ঢল নেমেছে । ধূসর সাহারায় ॥
দেখ্ আমিনা মায়ের কোলে । দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচি মুখে শাহাদাতের । বাণী সে শোনায় ॥
আজকে যত পাপী ও তাপী । সব গুনাহের পেল মাফি
দুনিয়া হতে বে-ইনসাফী । জুলুম নিল বিদায় ॥
নিখিল দরূদ পড়ে লয়ে ও-নাম । সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
জিন, পরী ফেরেশতা সালাম । জানায় নবীর পায় ॥
ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় ॥

رب سلم على رسول الله
مرحبا مرحبا رسول الله

حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے

حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
سلام کے لیئے حاضر غلام ہو جائے

میں صرف دیکھ لوں اک بار صبح طیبہ کو
بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے

نظر سے چوم لوں اک بار سبز گنبد کو
بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے

تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہء جاں
کبھی جو اُن کی گلی میں قیام ہو جائے

حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل
سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے

حضور آپ جو سن لیں تو بات بنتی ہے
حضور آپ جو کہ دیں تو کام ہو جائے

مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہ دیں
صبیح مدحت خیر الانام ہو جائے

حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
سلام کے لیئے حاضر غلام ہو جائے

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہ
مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللّٰہ

হুজুর এয়সাঁ কোয়ী ইন্তেজাম হো জায়ে

হুজুর এয়সাঁ কোয়ী ইন্তেজাম হো জায়ে
সালাম কে লিয়ে হাজির গোলাম হো জায়ে ॥

ম্যেয়ঁ সিফ দেখলু একবার সুবহে তেয়বা কো
বালা সে ফির মেরী দুনিয়া মেয়ঁ শাম হো জায়ে ।

নাযার সে চুমলু একবার সাবজ গুম্বাজকো
বালা সে ফির মেরী দুনিয়া মেয়ঁ শাম হো জায়ে ।

তাজ্জালিয়াত সে ভার লু ম্যেয়ঁ আপনা কায়সায়ে জাঁন
কাভী যো উনকে গালী মে কেয়াম হো জায়ে ।

হুজুর আপ জো চাহেঁ তো কুচ নাহী মুসকিল
সীমাট কে ফাসলা ইয়ে চানঁদ গাম হো জায়ে ।

হুজুর আপ জো সুনলে তো বাত বান যায়ে
হুজুর আপ জো কেহদে তো কাম হো জায়ে ।

মাজা তো জাব ফেরিস্তে ইয়ে কাবরা মে ক্যহ দে
সাবহী মিদ হাতে খায়রুল আনাম হো জায়ে ।

হুজুর এয়সাঁ কোয়ী ইন্তেজাম হো জায়ে
সালাম কে লিয়ে হাজির গোলাম হো জায়ে ॥

رب سلم على رسول الله

مرحبا مرحبا رسول الله

آمنہ بی بی کے گلشن میں

آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار

پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار

نبی جی اللہ اللہ ھو لاالٰہ الا ھو

بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم

ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم

نبی جی اللہ اللہ ھو لاالٰہ الا ھو

حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار

جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار

نبی جی اللہ اللہ ھو لاالٰہ الا ھو

دور بلائیں کرنے والا امت کا غم خوار

حافظ و حامی، شافع و نافع رحمت کی سرکار

نبی جی اللہ اللہ ھو لاالٰہ الا ھو

پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول

نور کا پتلا چاند سا مکھڑا حق کا پیارا رسول

نبی جی اللہ اللہ ھو لا الہٰ الا ھو

جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان

سوجا سوجا رحمت عالم میں تیرے قربان

نبی جی اللہ اللہ ھو لا الہٰ الا ھو

رب سلم على رسول الله

مرحبا مرحبا رسول الله

আমেনা বিবি কে গুলশান মে

আমেনা বিবি কে গুলশান মে আয়ী হে তাজা বাহার
পারতে হে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ দারো দিওয়াঁ নবীজী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু

বারা রবিউল আউয়ালকো ওয় আয়া দুররে এতীম
মাহে নবুওত মেহরে রিসালাত সাহেবে খালকে আজীম নবীজী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু

হামিদ ও মেহমুদ আওর মুহাম্মাদ দো জাগকে সারকার
জানছে পেয়ারা রাজ দুলারা রেহমাতকে সারকার নবীজী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু

দুর বালায়েঁ কারনে ওয়ালা উম্মত কা গামখার
হাফিজ ও হামী, শাফী ও নাফী রেহমাতকে সারকার নবীজী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু

পিয়ারী সুরাত হাসতা চেহরা মু সে জারতে ফুল
নুর কা পুতলা চাঁদ কা টুকরা হাক্ব কা পেয়ারা রাসূল নবীজী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু
জিব্রাইল আয়ে ঝুলা ঝোলানে লোরীদে জীশান
সোওজা সোওজা রাহমতে আলম মেয়ঁ তুজপে কুরবান নবীজী
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه
مَرْحَبَا مَرْحَبَا رَسُوْلَ اللّٰه

তাওয়াললুদ শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ — وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ عَلٰى
اَشْهَرِ الْاَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ — تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ الْمُنَوَّرَةِ اَبُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ — وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ
بِاَخْوَالِهٖ بَنِيْ عَدِيٍّ مِّنَ الطَّائِفَةِ النَّجَارِيَّةِ — وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُّعَانُوْنَ سُقْمَهٗ
وَشَكْوَاهُ — وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاجِعِ تِسْعَةُ اَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ — وَاٰنَ
لِلزَّمَانِ اَنْ يَّنْجَلِيَ عَنْهُ صَدَاهُ — حَضَرَتْ اُمَّهٗ لَيْلَةَ مَوْلِدِهٖ اٰسِيَةُ وَمَرْيَمُ فِيْ نِسْوَةٍ مِّنَ الْحَظِيْرَةِ
الْقُدْسِيَّةِ — وَاَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْبَدْرِ الْمُنِيْرِ نُوْرًا يَتَلَأْلَأُ سَنَاهُ —

উচ্চারণ ঃ নাহমাদুহগু ওয়া নুছল্লী আ'লা রাসূলিহিল কারীম, ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা শাহরানি আ'লা আশহারিল আকওয়ালিল মারবিইয়্যাহ তুউফফিয়া বিলমাদীনাতিশ শারীফাতিল মুনাওয়ারাতি আবূহু আবদুল্লাহ, ওয়া কানা ক্বাদিজতাযা বিআখওয়ালিহী বানী আদিয়্যিম মিনাত্ব ত্বা-য়িফাতিন নাজ্জারিয়াহ ওয়া মাকাসা ফীহিম শাহরান সাক্বীমাই ইউআনূনা সুক্বামাহগু ওয়া শাকওয়াহ। ওয়া লাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আ'লার রাজিহি তিসআতু আশহারিন ক্বামারিয়াহ, ওয়া আনা লিয়্যামানি আঁইয়্যানজালিয়া আনহু ছাদাহ, হাদ্বারাত উম্মাহগু লাইলাতা মাওলিদিহী আসিয়াতু ওয়া মারইয়ামু ফী নিসওয়াতিম মিনাল হাদ্বীরাতিল কুদসিইয়্যাহ, ওয়া আখাযাহাল মাখাদ্বু ফাওয়ালাদাতহগু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (কালবাদরিল মুনীরি) নূরাই ইয়াতালালা 'উসিনাহ।

অর্থ ঃ প্রসিদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন তাঁর মাতৃগর্ভে দু'মাস পূর্ণ হল, তখন মদীনা মোনাওয়ারাতে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তিনি (আবদুল্লাহ) তার বনি আদী গোত্রীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভুক্ত মামাদের সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে এক মাস রোগে ভুগলিলেন। তারপর যখন গ্রহণযোগ্য বর্ণনা অনুসারে নয়টি চন্দ্র মাস পূর্ণ হলো এবং তাঁর আগমনী বার্তা প্রকাশ হওয়ার সময় হলো তখন তাঁর শুভাগমনের পবিত্র রাতে তাঁর মায়ের সকাসে উপস্থিত হয়ে গেলেন মহিয়সী নারীদের পূত পবিত্র সমাবেশ। এদের মধ্যে ছিরেন পূণ্যময়ী আছিয়া ও মারইয়াম। এ সময় তাঁর প্রসব প্রক্রিয়া শুরু হলো এবং (মা আমেনা) পূর্ণিমার চাঁদের মত আলো ঝলমল শিশু প্রসব করলেন।

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللّٰهِ

আরবী কিয়ামের কাসিদা

طلع البدر علينا

يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيْكَ — يَا رَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا حَبِيْب سَلَامٌ عَلَيْكَ — صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ

১) طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — ত্বালাআল বাদরু আলাইনা

مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ — মিন ছানিআতিল ওয়াদায়ি

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا — ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা

مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ — মাদাআ লিল্লাহি দায়ী।

يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيْكَ — يَا رَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ

يَا حَبِيْب سَلَامٌ عَلَيْكَ — صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْكَ

২) أَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — আশরাক্বাল বাদরু আলাইনা

وَاخْتَفَتْ مِنْهُ الْبُدُوْر — ওয়াখ্‌তাফাত মিনহুল বুদূরু।

مِثْلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْنَا — মিছলাহুসনিক মা রাআইনা

قَطُّ يَا وَجْهَ السُّرُوْر — ক্বাত্তু ইয়া ওয়াজহাস সুরূরী

يَا نَبِى سَلاَمٌ عَلَيكَ	يَا رَسُول سَلاَمٌ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلاَمٌ عَلَيكَ	صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيكَ
مَنْ رَأَى وَجْهَكَ يَسْعَدُ	৩) মাইয়্যারা ওয়াজহাকা ইউআদ
يَا كَرِيمَ الوَالِدَيْنِ	ইয়া কারীমাল ওয়ালিদাইনি
حَوْضُكَ الصَّافِي المُبَرَّد	হাওদ্বাকাছ্ ছাফিল মুবাররাদ
وِرْدُنَا يَوْمَ النُّشُور	বিরদুনা ইয়াওমান্ নুশূরী
يَا نَبِى سَلاَمٌ عَلَيكَ	يَا رَسُول سَلاَمٌ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلاَمٌ عَلَيكَ	صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيكَ
يَا حَبِيبِي يَا مُحَمَّدُ	৪) ইয়া হাবীবী ইয়া মুহাম্মদ
يَا عَرُوسَ الخَافِقَيْنِ	ইয়া আরূসাল খাফিক্বাইনি
يَا مُؤَيَّدْ يَا مُمَجَّدْ	ইয়া মুআইয়্যাদ ইয়া মুমাজ্জাদ
يَا إِمَامَ القِبْلَتَيْنِ	ইয়া ইমামাল ক্বিবলাতাইনি
يَا نَبِى سَلاَمٌ عَلَيكَ	يَا رَسُول سَلاَمٌ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلاَمٌ عَلَيكَ	صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيكَ

৫) রাব্বানা সাল্লি আলা মান	رَبَّنَا صَلِّ عَلٰى مَنْ
হাল্লা ফি খাইরিল বিকাইয়ী	حَلَّ فِيْ خَيْرِ الْبِقَاعِ
ওয়া আলইহি কাল্লা হু সাল্লাম	وَعَلَيْكَ اللّٰهُ سَلَّمْ
দা' ইমান তুলাদ দুহুরী	دَائِمًا طُوْلَ الدُّهُرْ
يَا رَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ	يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيْكَ
صَلَوَاتُ اللّٰه عَلَيْكَ	يَا حَبِيْب سَلَامٌ عَلَيْكَ
৬) আনতা শামসুন আনতা বাদরুন	أَنْتَ شَمْسٌ أَنْتَ بَدْرٌ
আনতা নূরুন ফাওক্বা নূরী	أَنْتَ نُوْرٌ فَوْقَ نُوْرٍ
আনতা একসীরুওঁ ওয়া গালী	أَنْتَ إِكْسِيْرٌ وَّغَالٍ
আনতা মিছবাহুছ ছুদূরি	أَنْتَ مِصْبَاحُ الصُّدُوْرِ
يَا رَسُوْل سَلَامٌ عَلَيْكَ	يَا نَبِي سَلَامٌ عَلَيْكَ
صَلَوَاتُ اللّٰه عَلَيْكَ	يَا حَبِيْب سَلَامٌ عَلَيْكَ

رَبِّ سَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

مَرْحَبًا مَرْحَبًا رَسُوْلَ اللّٰهِ

বাংলা কিয়ামের কাসিদা

يَا نَبِى سَلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُول سَلَامُ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيكَ صَلَوَاتُ الله عَلَيكَ

১) তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায় আঁধারে ডুবিত সবই

يَا نَبِى سَلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُول سَلَامُ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيكَ صَلَوَاتُ الله عَلَيكَ

২) তোমারেই নূরের আলোকে জাগরণ এলো ভগুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল ফুটিল কুসুম পুলকে

يَا نَبِى سَلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُول سَلَامُ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيكَ صَلَوَاتُ الله عَلَيكَ

৩) নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদার
হয়েছি উম্মাত আপনার তার তরে শোকর হাজার বার

يَا نَبِى سَلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُول سَلَامُ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيكَ صَلَوَاتُ الله عَلَيكَ

৪) আপনাকে যেজন দেখিবে জাহান্নাম হারাম হইবে
আমাদের আশা দেখিতে দিওয়ানা বানান দীদারে।

يَا نَبِى سَلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُول سَلَامُ عَلَيكَ
يَا حَبِيب سَلَامُ عَلَيكَ صَلَوَاتُ الله عَلَيكَ

৫) মদীনায় যাবেন হাজীরা যিয়ারত করবেন রওজা
আমাদের নছীব হল না পাঠালাম সালাম মদীনায়।

يا نبى سلام عليك   يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك   صلوات الله عليك

৬) তুমি যে আখেরী নবী   দ্বীনের পূর্ণ রবি

রহমতে আলম তুমি   হে রাসূল! আল আরবী

يا نبى سلام عليك   يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك   صلوات الله عليك

৭) আসিলে মরুর দেশে   সকল নবীর শেষে

উসওয়াতুল হাসানা যে   মুস্তাফা খোশ লকবী

يا نبى سلام عليك   يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك   صلوات الله عليك

৮) কামালে পূর্ণ তুমি   জামালে পূর্ণ তুমি

অপরূপ এ্ভাব আচরণে   গাহিল মানব মানবী

يا نبى سلام عليك   يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك   صلوات الله عليك

رب سلم على رسول الله

مرحبا مرحبا رسول الله

উর্দু কিয়ামের কাসিদা

یاَ نبی سَلاَمٌ عَلَیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمٌ عَلَیکَ
یاَ حَبیب سَلاَمٌ عَلَیکَ   صَلَوا تُ اللهِ عَلَیکَ

১) রেহমাতোকে তাজ ওয়ালে	۱) رحمتوں کے تاج والے
দোঁজাহান কে রাজ ওয়ালে	دو جہاں کے راج والے
আরশকে মেরাজ ওয়ালে	عرش کی معراج والے
আঁশিও কে লাজ ওয়ালে	عاصیوں کی لاج والے

یاَ نبی سَلاَمٌ عَلَیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمٌ عَلَیکَ
یاَ حَبیب سَلاَمٌ عَلَیکَ   صَلَوا تُ اللهِ عَلَیکَ

২) আপ সুলতানে মাদীনা	۲) اپ سلطان مدینہ
মেহবাতে ওহীহো সাঁকিনা	مجتبی وہیو سکینہ
নূর সে মামুর সীনা	نور سے معمور سینہ
মুশক সে বেহতার পাসীনা	مشک سے بہتر پسینہ

یاَ نبی سَلاَمٌ عَلَیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمٌ عَلَیکَ
یاَ حَبیب سَلاَمٌ عَلَیکَ   صَلَوا تُ اللهِ عَلَیکَ

৩) কিয়া কারে বেদিল শিকায়াত	۳) کیا کریں بیدل شکایت
দারদে হিজরা কি হিকায়াত	درد ہجراں کے حکایت
রাঞ্জোগাম হে বেনেহায়াত	رنج و غم ہے بے نہایت
কি জিয়ে লিল্লাহ এনায়েত	کیجئے للہ عنایت

یاَ نبی سَلاَمٌ عَلَیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمٌ عَلَیکَ
یاَ حَبیب سَلاَمٌ عَلَیکَ   صَلوٰاتُ اللہ عَلَیکَ

৪) হোগী জাব বেহাল উম্মত — ۴) ہو گی جب بیحال امت
আয়েঙ্গে পেয়াঁরে মুহাম্মদ ﷺ — ائیں گے پیارے محمد ﷺ
লেকার পেয়াগামে শাফায়াত — لیکر پیغام شفاعت
মিলেগি উম্মাত কো জান্নাত — ملے گی امت کو جنت

یاَ نبی سَلاَمٌ عَلَیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمٌ عَلَیکَ
یاَ حَبیب سَلاَمٌ عَلَیکَ   صَلوٰاتُ اللہ عَلَیکَ

৫) হেয় ইয়াহী দিল কি তামান্না — ۵) یہ ہی ہے دل کی تمنا
কাবে পার হামে বুলানা — کعبہ پر ہمیں بلانا
মাদীনা হামে দিখানা — مدینہ ہمیں دیکھانا
হাশরমে হামে বাঁচানা — حشر میں پر ہمیں بچانا

یاَ نبی سَلاَمٌ عَلَیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمٌ عَلَیکَ
یاَ حَبیب سَلاَمٌ عَلَیکَ   صَلوٰاتُ اللہ عَلَیکَ

৬) কাফেলা চালতা রাহা — ۶) قافلہ چلتا رہا
মেরা দিল মাচালতা রাহা — میرا دل مچلتا رہا
জানে ওয়ালে মাদীনা গায়ে — جانے والے مدینہ گے
মে তারাপতারাহা — میرا دل تڑپتا رہا
মেরে মাওলা মুঝে ভি বুলালে ফির, — میرے مولا مجھے بھی بلالے
দিয়ারে মাদীনা — پھر دیار مدینہ

یاَ نبی سَلاَمُ عَلیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمُ عَلیکَ
یاَ حَبِیب سَلاَمُ عَلیکَ   صَلوٰا تُ اللہ عَلیکَ

৭) সারওয়ারে কাওনেন তুমহি হো	۷) سرور کونین تم ہی ہو
শাফীয়ে মেহশার তুমহি হো	شافع محشر تم ہی ہو
সাইয়্যোদুল বাশার তুমহি হো	سید البشر تم ہی ہو
হাশার কা সাহারা তুমহি হো	حشر کا سہارا تم ہی ہو

یاَ نبی سَلاَمُ عَلیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمُ عَلیکَ
یاَ حَبِیب سَلاَمُ عَلیکَ   صَلوٰا تُ اللہ عَلیکَ

৮) বাঁখশ কা চামকা সিতাঁরা	۸) بخش کا چمکا ستارا
হাজিরি কা হে ইশারা	حاضر کا ہے اشارا
দেখকার রাঁওজা পিয়ারা	دیکھ کر روضہ پیارا
ইয়ে কাহে খাদিম তুমহারা	یہ کہے خادم تمہارا

یاَ نبی سَلاَمُ عَلیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمُ عَلیکَ
یاَ حَبِیب سَلاَمُ عَلیکَ   صَلوٰا تُ اللہ عَلیکَ

৯) জাশনে মিলাদুন্নবী হে	۹) جشن میلاد النبیؐ ہے
নূর কি চাদর তানি হে	نور کی چادر تنی ہے
রোশনী হি রোশনী হে	روشنی ہی روشنی ہے
রেহমাতে বারাশ রাহী হে	رحمتیں برس رہی ہے

یاَ نبی سَلاَمُ عَلیکَ   یاَ رَسُول سَلاَمُ عَلیکَ

يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك

১০)গুলশানে খুশবু মাদীনা	۱۰) گلشنِ خوشبو مدینہ
রাওনাকে আলাম মাদীনা	رونقِ عالم مدینہ
নবীকা রাওজা মাদীনা	نبی کا روضہ مدینہ
জান্নাত সে পেয়ারা মাদীনা	جنت سے پیارا مدینہ

يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك

১১)কাশ হাসিল হো হুজুরী	۱۱) کاش حاصل ہو حضوری
দুর হো জায়ে ইয়ে দূরী	دور ہو جائے یہ دوری
দেখলু ও সাকলে নূরী	دیکھ لوں وہ شکلِ نوری
দিল কি হাশরাত হো ইয়ে পুরী	دل کی حسرت ہو پوری

يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك

يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك

رب سلم على رسول الله

مرحبا مرحبا رسول الله

مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی

مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

مہر چرخ نبوت پہ روشن درود
گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام

شبِ اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود
نوشہء بزم جنت پہ لاکھوں سلام

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام

جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
اُس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام

ہم غریبوں کے آقا پر بیحد درود
ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام

کاش محشر میں جب اُن کی آمد ہو اور
بھیجیں سب اُن کی شوکت پہ لاکھوں سلام

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضاؔ
مصطفی جانِ رحمت پے لاکھوں سلام

মুস্তাফা জানে রেহমাত পে লাখোঁ সালাম

-আলা' হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান (রহ:)

মুস্তাফা জানে রেহমাত পে লাখোঁ সালাম
শামায়ে বাজমে হেদায়াত পে লাখোঁ সালাম

মেহরে চারখে নবুয়্যত পে রওশন দরূদ
গুলে বাগে রিসালাত পে লাখোঁ সালাম

শাবে আসরা কে দুলহা পে দায়েম দরূদ
নওশায়ে বাজমে জান্নাত পে লাখোঁ সালাম

জিস কি মাথে পার শাফায়াত কা সেহরা সাঁজা
উছ জাবিনে সাআদাত পে লাখোঁ সালাম

জিস সুহানী ঘড়ি চামকা তায়বা কা চান্দ
উছ দিল আফরোজ ছা আত পে লাখোঁ সালাম

হাম গারীবো কে আকা পে বেহাত দরূদ
হাম ফাকীরো কে সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম

কাশ মেহশার মে যাব উনকী আমাদ হো আওর
বেজে সাব উনকী সাওকাত পে লাখোঁ সালাম

মুজসে খিদমাত কে খুদসী কাহে হা রেজা
মুস্তাফা জানে রেহমাত পে লাখো সালাম

رب سلم على رسول الله
مرحبا مرحبا رسول الله

দু'আ

আল্লাহর শেখানো দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (سورة البقرة ٢٠١)

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দাও আমাদের এ দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও দিও কল্যাণ, আর আমাদের বাঁচাও জাহান্নামের শাস্তি থেকে। (সূরা আল বাকারা-২০১)

মানুষ সসীম। সে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। তাকে তার সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব আল্লাহ অর্পণ করেন না। সে তার শক্তি ও সামর্থের মধ্যে যা কিছু ভাল বা মন্দ করবে, সে তার প্রতিফল পাবে। তাই তাকে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অক্ষমতার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে–

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وقفة وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وقفة وَارْحَمْنَا وقفة أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (سورة البقرة ٢٨٦)

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার তুমি অর্পণ করেছিলে আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তেমন ভার আমাদের দিওনা; হে আমাদের প্রতিপালক! এমন বোঝা আমাদের দিওনা যার ভার বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। আমাদের বিজয়ী কর সত্য প্রত্যাখানকারীদের ওপর। (সূরা আল বাকারা-২৮৬)

সকল দোয়ার একত্রিত রূপ

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, যে, নবী করীম ﷺ বহু দোয়া করেছিলেন আমরা সেগুলোর কিছুই সংরক্ষণ করে রাখতে পারিনি। আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অসংখ্য দোয়া করেছেন, আমরা সেগুলো থেকে কিছুই সংরক্ষিত করতে পারিনি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন- আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দোয়ার কথা বলে দেব যা এই সবগুলো দোয়াকে একত্রিত করে দেব? তোমরা এই বলে দোয়া কর-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ তোমার কাছে যে সব কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন, আমি সেসব কল্যাণ তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তোমার নবী মুহাম্মদ যেসব অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তুমিই সাহায্যকারী। তোমার কাছে সব পৌঁছে যাবে এবং তুমি ছাড়া কোন আশ্রয় ও শক্তি নেই। (তিরমিযী)

দরূদে কামিলা **صلوة كاملة**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلٰوةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدِ وَتَنْفَرِجَ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمُ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি সালাতান কামিলাতান ওয়া সাল্লিম সালামান তাআম্মান আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ নিল্লাযি তানহাল্লু বিহিল উক্বাদি ওয়া তানফারিজা বিহিল কুরাবু ওয়া তুক্বদ্বোয়া বিহিল হাওয়াইজু ওয়া তুনালু বিহির রাগ্বাইবু ওয়া হুসনুল খাওয়াতিম ওয়া ইয়ুসতাসক্বাল গ্বামামু বিওয়াজহিহিল কারিম ওয়া আলা আলিহি ওয়াছাহবিহি ফি কুল্লি লাম হাতিন ওয়া নাফাসিন বিআদাদি কুল্লি মাআলু মিল্লাক।

দরূদে তুনাজ্জিনা **صلوة تنجينا**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদাওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদাওঁ সালাতুন তুনাজ্জিনা বিহা মিন জামিয়্যিল আহওয়ালি ওয়াল আফাত ওয়া তাক্বজিলানা বিহা জামিইল হাজাত ওয়াতুতাহহিরুনা বিহা মিন জামিয়্যিস সাইয়্যিআত ওয়াতারফাউনা বিহা ইনদাকা আলাদ্দারাজাত ওয়াতুবাল্লিগুনা বিহা আক্বছাল গ্বায়াত মিন জামিয়্যিল খাইরাতি ফিল হায়াতি ওয়াবাদাল মামাতি ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাঁকে ভালবাসা ও তাঁকে অনুসরণের গুরুত্ব

"My choice to Muhammad ﷺ to lead the world most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.[1]"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে বিশ্বের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষে রাখা আমার পছন্দ অনেক পাঠককে বিস্মিত আবার অন্যদের নিকট প্রশ্নবিদ্ধও হতে পারে। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও সামাজিক/বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চতম সফল।

উল্লেখিত কথাগুলো আমাদের প্রিয়নবী মুহম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে উক্তিটি করেছেন, Michacl H Heart নামক এক মার্কিন অমুসলিম লেখক। সে তার রচিত বই The 100 : A Ranking of the most influetial person in the history[2] বইয়ে বিশ্বের সেরা ১০০ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রথম স্থানে উল্লেখ করেছেন সাইয়্যেদুল মুরসালিন শাফিউল মুজনাবিন, খাতামুন নাবিয়্যিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে।

আসলে প্রিয়নবীর উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আখলাকের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এমনকি কাফির আবু লাহাব, আবু জাহাল প্রমুখও নবীর নবুওয়াত অস্বীকার করলেও তার চরিত্রের ব্যাপারে ও তাঁর মহান বক্তিত্বের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। এরা তো হচ্ছে পূর্বযুগের ব্যক্তিরা। বর্তমান যুগে জর্জ বার্নাডস, নেপোলিয়ন,

---

১ এখানে religious and secular levels বুঝাতে বলা হয়েছে আমাদের প্রিয়নবী শুধুমাত্র একজন নবী বা ধর্মপ্রচারক ছিলেন এমন নয়, বরং একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। যিনি আল্লাহর আইন ও হুকুম মোতাবেক একটি রাষ্ট্র (মদীনা) সর্বোচ্চ সফলতার সাথে পরিচালনা করেছিলেন। বিশ্বের অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। এইজন্য আমাদের প্রিয়নবী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তার পাশাপাশি একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক।

২ এই বইটি বিশ্বের ১৫টি ভাষায় (বাংলা সহ) অনূদিত হয়েছে এবং পাঁচলক্ষের বেশী কপি বিক্রি হয়েছে।

ইউলিয়াম মুর, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওয়াহের-লাল নেহেরু সহ আরো অনেক অমুসলিম মনীষী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

এখানে একটি কথা বলতেই হয়, এইসব অমুসলিমরা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রশংসা করেছে কারণ তারা তাকে চিনতে পেরেছে। তবে জেনে রাখুন, এরা কেউ কিন্তু এর পরকালীন কোনো বিনিময় পাবে না। কারণ তারা ঈমান আনে নি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি।

যদি কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার আদর্শ কে? তখন শুধু একটাই সহীহ জওয়াব করেছে আর সেটা হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ। যদি এর বাইরে অন্য কোনো উত্তর হয় তবে বড়ই আফসোস তার জন্য। আমাদের জানতে হবে যে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সবার জন্য তিনিই সেরা আদর্শ।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দুনিয়াতে মানুষ করেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি দুনিয়াবী জীবন যাপন করেছেন, বিয়ে শাদী করেছেন, সন্তান হয়েছে, তাঁরও ক্ষুধা লাগত এবং যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের আঘাতে আহতও হয়েছেন এবং তাঁর পবিত্র শরীরও রক্তাক্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আমার আর আপনার মতই মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা নিজ মানবীয় জীবনকে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলতে পারি।

তবে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে কখনো নিজেদের মতো সাধারণ মানুষ ভাববেন না। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল কিন্তু আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ নন। শরীয়তের বিভিন্ন আহকাম তাঁর জন্য আমাদের চেয়ে আলাদা। যেমন–

- তিনি ঘুমালেও তাঁর ওযু ভাঙ্গত না।
- সাওমে বিসাল বা না খেয়ে ধারাবাহিক রোযা রাখার অনুমতি কেবল তাঁর জন্য।
- তাঁর জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ নিয়মিত আদায় করা আবশ্যক ছিল।
- দুনিয়ার ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর বংশ নিজ কন্যা হযরত ফাতেমাতুয যোহরা (রা.) ও তাঁর দৌহিত্রদ্বয় ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসেইন (রা.) থেকে জারি আছে।

এখানে বর্ণিত খাস বৈশিষ্ট্যগুলো মানবজাতির মধ্যে কেবল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর প্রাপ্তি অন্য কারোও নয়। তাই বিশ্বনবীকে কখনোই আমার ও আপনার মতো সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য করবেন না। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামরাও সর্বোচ্চ আদব প্রদর্শন করতেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে।

তাঁর একটি নজির এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে। একবার জনৈক ব্যক্তি প্রিয়নবীর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের মধ্যে বড় কে?[৩] জবাবে হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, বয়সে তো আমি বড় তবে মর্যাদায় আমার ভাতিজা (প্রিয়নবী) অনেক বড়। সুবহানাল্লাহ।

কি আদব ছিল সাহাবায়ে কেরামদের ব্যবহার-মর্যাদায়। হযরত আব্বাস (রা.) যিনি নবীজীর চাচা, বয়সেও বড়। সম্পর্কেও বড় তারপরও জবাব এমনভাবে দিলেন যাতে তাঁর ভাতিজা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর মর্যাদা সর্বাধিক।

এটাতো গেল প্রিয়নবীকে চেনা ও জানার প্রসঙ্গ। এখন আসা যাক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে যেটা হচ্ছে তাঁকে মুহাব্বত ও তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা।

মহানবী ﷺ মুহাব্বত করা

মহানবী ﷺ এর প্রতি উম্মতের প্রকৃত দায়িত্ব হল তাঁর সাথে মুহাব্বত ও তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

কারো সঙ্গে মুহাব্বত হওয়া এবং সেই মুহাব্বতের কারণে তাঁর অনুগত হওয়া সাধারণত ঃ তিনটি কারণে হয়ে থাকে।

☆ **প্রথমতঃ** প্রিয়তমের কোন বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মুহাব্বত হয় যেমন কোন আলেম ও বীরপুরুষের সংগে মুহাব্বত হয়।

☆ **দ্বিতীয়ত ঃ** রূপ ও সৌন্দর্য্যের কারণে মুহাব্বত হয় যেমন কোন সুন্দর মানুষের সঙ্গে মুহাব্বত হয়।

☆ **তৃতীয়ত ঃ** কোন কৃপা ও করুণা লাভের কারণেও মুহাব্বত হয়।

মহানবী ﷺ এর মহান জীবন এই তিন প্রকারে বৈশিষ্ট্যই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। মুহাব্বত বা ভালবাসার সকল প্রকার উপকরণই যখন মহানবী ﷺ এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে তাই তাঁর সঙ্গে উম্মতের মহব্বত পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনিবার্য। এ ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে অনেক। তবুও স্বভাব ও বিবেচনার সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা একত্রিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মুহাব্বত এবং ভালবাসাকে ওয়াজেব ও অনিবার্য করে দিত। একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে যে, এই সমস্ত কারণে মহানবী ﷺ এর সংগে মুহাব্বত হওয়ার পর তার অনুসরণ থেকে

---

[৩] হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন প্রিয়নবীর চাচা। তাঁর সাথে প্রিয়নবীর বয়সের পার্থক্য খুব কম ছিল। তাই আব্বাস (রা.) কে এই প্রশ্ন করল।

বিরত থাকা, অসম্ভব, অকল্পনীয়। মহানবী ﷺ এর সংগে যার ভালবাসার যত বেশী হবে, তাঁর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যও তত বেশী।

বলাবাহুল্য হযরত রসূলে করীম ﷺএর সংগে ভালবাসা স্থাপন করাও যদি পরিপূর্ণ ভাবে ওয়াজেব হয় তবে আনুগত্য প্রকাশ করাও পরিপূর্ণভাবে অনিবার্য হবে। যদিও এ সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারে না, তবে শুধু মাত্র বিষয়টির প্রতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে উপদেশমূলক আলোচনা করা হচ্ছে আর এই পর্যায়ে কয়েকখানা হাদীসও উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রিয়নবী ﷺএরশাদ করেছেন ঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ - (متفق عليه)

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পরাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানবজাতির মধ্যে সব চেয়ে প্রিয় না হই। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম বোখারী আবদুল্লাহ এবনে হিশাম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ আপনি আমার নিকট সকল বস্তুর চেয়ে সর্বাধিক প্রিয়। তবে আমার প্রাণ আমার নিকট অধিক প্রিয়। প্রিয়নবী ﷺএরশাদ; করলেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমীন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয় না হই। হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, আপনি আমার প্রাণের চেয়ে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। মহানবী ﷺএরশাদ করলেন হাঁ এখন ঈমান অধিক ও পরিপূর্ণ হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্যেক মহব্বতকে পরোক্ষ মহব্বত থেকে অধিক দৃঢ় মনে করে প্রথমে নিজের প্রাণকে অধিক প্রিয় বলেছিলেন।

একই বিষয় মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করছেন এভাবে-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○ (سورة التوبة ٢٤)

অর্থ : বলুন, (হে নবী আপনি বলে দিন) যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসায় মন্দা দেখার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাক এবং তোমাদের যে বাসস্থানকে তোমরা খুবই পছন্দ কর, এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর

ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, আল্লাহ কখনও ফাসেকদের (সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে) সৎপথের সন্ধান দেন না। (সূরা তওবা : ২৪)

হুজুর আকরাম ﷺ এরশাদ করলেন ঃ যে আমার অনুকরণ বা মহান আদর্শকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথে বেহেশতে থাকবে। (তিরমিজী ও মিশকাত)

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী ﷺ-র প্রতি ভালবাসা পোষণ করার চিহ্ন হলো তাঁর সুন্নত বা মহান আদর্শের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। আর এই হাদীস দ্বারা তাঁর প্রতি ভালবাসার রাখার ফজিলত প্রমাণিত হলো কেননা, এটিই হলো বেহেশতের চাবি এবং বেহশতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের কারণ।

শুধু মুহাব্বত করলেই নয়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে ভালবাসা প্রত্যেক ব্যক্তির মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত। তবে শুধু বিশ্বনবীকে ভালবাসলে তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না বরং আরো আরো দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ তাঁকে মুহাব্বত করার পাশাপাশি তাঁর সুন্নতকেও অনুসরণ করতে হবে, পালন করতে হবে।

অনেকেই আছে যারা কেবল মুখে বিশ্বনবীর প্রশংসা করেই তাঁদের দায়িত্ব শেষ করে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, অনুসরণের চেষ্টাও করে না। এরাও পূর্ণ ঈমানদার নয় যারা বিশ্বনবীর সুন্নতের উপর আমল না করে। কারণ বিশ্বনবীরক মর্যাদা ও তাঁর শান ও শওকত এটা আমরা তখনই বুঝতে পারব যখন তাঁর সুন্নতের পাবন্দ হব।

বিশ্বনবীর সুন্নতের অনুসারী না হলে কোনোভাবেই তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। তবে আফসোস আজকাল তাঁর নাম স্মরণকারী অনেক আছে, কিন্তু সে তুলনায় তাঁর উসওয়াতুল হাসানাহ অনুসরণকারী লোকের সংখ্যা খুবই কম।

যদি আপনি নিজের মাকে বলেন আমি আপনাকে খুব সম্মান করি, খুব আদর করি, খুব মুহাব্বত করি। কিন্তু তাঁর কথা মানবেন না, অথবা তাঁর সাথে ঝগড়া করবেন, বেয়াদবী করবেন তাহলে আপনি কখনও একজন বাধ্যগত সন্তান হতে পারবেন না। অনুরূপভাবে শুধু ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬ মার্চ ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় দিবগুলোতে খুব নিজের দেশের কথা স্মরণ করলেন বাদ বাকী দিনসমূহে নিজের দেশের প্রতি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য বেমালুম ভুলে গেলেন তবে কখনই আপনি বাংলাদেশের একজন সুনাগরিক বলে বিবেচিত হবেন না। একইভাবে

শুধু মাত্র রবিউল আউয়াল মাসে প্রিয়নবীকে মুহাব্বত করলেন, অনেক নাতে রাসূল পড়লেন, মিলাদ করলেন, يانبى سلام عليك পড়লেন, আর দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রিয়নবীর নির্দেশিত পথ উপেক্ষিত করবেন তাহলেও আপনি প্রকৃত মুসলমান হতে পারবেন না।

যদি আপনি মুখে দাড়ি রাখলেন না, নিয়মিত জামাতের সাথে নামায পড়েন না, প্যান্ট-পায়জামা টাখনুর নিচে পরিধান করেন, লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাত হলে সালাম না দিয়ে Hello অথবা Good morning, Good evening বলেন, তাহলে এখনই সাবধান হয়ে যান। কারণ আপনার এই জীবন প্রিয়নবীর সুন্নাত মোতাবেক নয়। এইজন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে মুহাব্বতও করতে হবে এবং তাঁর সুন্নতের অনুসরণও করতে হবে।

প্রিয়নবীর সুন্নতকে অনুসরণের গুরুত্ব

আল্লাহর প্রিয়হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে যেমন ভালবাসতে হবে তেমনি তাঁর নির্দেশনাগুলো নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাঁর প্রতিটি হুকুমকে কাজে পরিণত করতে হবে।

বর্তমান ফিতনার যুগে হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এর সুন্নত বাস্তবায়ন করা বেশ কঠিন কাজ। এইজন্য প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ ○ (مشكوة)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি ফাসাদের যুগে আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে। (মেশকাত)

এই হাদীসে সুন্নাত জিন্দা করার এত গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে কারণ সুন্নতকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শহীদদের চেয়েও অধিক শ্রমসাধ্য। কারণ শহীদ এক মুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। কিন্তু সুন্নাত পালনকারী বেচারা প্রতি মুহূর্তে সমাজের নানা প্রতিকূল অবস্থার স্বীকার হয়। এইজন্য তো প্রিয়নবী এরকম সুসংবাদ দান করেছেন। যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে তাঁর প্রতিটি কাজকেই পছন্দ করে।

ঠিক তেমনি যে একজন একনিষ্ঠ আশেকে রাসূল তার দৃষ্টিতে প্রিয়নবীর প্রতিটি কাজই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য। এইজন্য তো হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেছেন–

وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِى فَقَدْ اَحَبَّنِى وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ ○ (مشكوة)

অর্থ : যে আমার সুন্নতের অনুসরণকরবে (যে ভালবাসবে) সে আমাকেই ভালবাসে, আর যে আমাকে ভালবাসে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে। (মেশকাত)

শুধু অনুসরণ করলেই হবে না

ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা বাহ্যিক দিক দিয়ে দেখতে মুসলমানদের মতোই মনে হতেন, যাদের বেশভূষা ছিল ইসলামী, নিজের কাজের মাধ্যমে প্রিয়নবীর অনুসরণও করত এটা অন্যের কাছে জাহির করতো। কিন্তু অন্তর ছিল ইশকে রাসূলের দৌলত থেকে খালি, অন্তসারশূন্য। তাই এরা প্রত্যেকেই মুনাফিক ছিল এবং বেঈমান অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। এরকম এক ব্যক্তি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই[৪]। সে এমন লোক যে সর্বদা অন্তরে প্রিয়নবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, কিন্তু জনসম্মুখে তা প্রকাশ করতো না। সে নবীজির পিছনেই নামায পড়তো, অনেক সময় প্রথম কাতারেই থাকত। তার মুখেও দাড়ি ছিল, মাথায় টুপি ছিল। এই হতভাগা এমন ব্যক্তি ছিল যে, নবীপত্নী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর চরিত্রের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল।

এর নিফাক যখন প্রকাশ্য হয়ে গিয়েছিল তখন তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রা.) যিনি ঈমানদার সাহাবী ছিলেন তিনি প্রিয়নবীর কাছে নিজের পিতার হত্যা অনুমতি চাইলেন। কিন্তু দয়ার সাগর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। যখন এই রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ বিন উবাই মারা যায় তখন রাহমাতুল্লিল আলামীন নিজে তার জানাজা নামায পড়ানোর জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন এবং প্রিয়নবীকে এরূপ করতে বারণ করেন।

---

[৪] প্রিয়নবীর মদীনায় হিজরতের পূর্বে ইয়াসরিব (মদীনা) অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে সকল যুদ্ধে মদীনার যাবতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মারা যায়। মোট কথা সে সময় মদীনা নেতৃত্বশূন্য ছিল। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তাদের নেতা হিসেবে মনোনয়ন পায়। শুধুমাত্র তার নেতৃত্ব গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা বাকী ছিল। ঠিক এই সময়ে মদীনায় আগমন করেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ। এর ফলে নবীজী হয়ে উঠেন মদীনার অবিসংবাদিত নেতা এবং তিনিই মদীনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকেই আবদুল্লাহ বিন উবাই নবীজির সাথে শত্রুতা পোষণ করত। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরাট বিজয় দেখে সেও মুসলমান হয়ে যায় তবে কেবল লোক দেখানোর জন্য। আবার উহুদ যুদ্ধে জিহাদের নাম করে রওয়ানা হলেও যুদ্ধ শুরুর পূর্বে নিজ ৩০০ ব্যক্তিকে নিয়ে যুদ্ধ [illegible] নিজের মুনাফিক [illegible] পরিচয় দেয়।

এরকম মুনাফিকদের উদ্ভব ঘটেছিল হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতের শেষের দিকে। সে সময় ইসলামের সর্বপ্রথম বাতিল ফিরকার উদ্ভব ঘটে তারা ছিল খারেজী [৫]। এরাও নামায পড়ত তবে মুসলমান ছিল না। কারণ তারা হযরত আলী (রা.) সহ অনেক সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলত। (নাউযুবিল্লাহ)

এছাড়াও পাপীষ্ঠ ইয়াজীদ এর সময় যখন কারবালার ঘটনা ঘটে সেই ১০ই মহররম জুমার দিন ইমাম হুসাইন (রা.) এর শিবিরের জুমার নামায আদায় হয় আর ইয়াজীদের সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ এর শিবিরেও জুমার নামায হয়। এই দুই দলের মধ্যে কারা ছিল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের মুহব্বতের ও সুন্নতের অনুসারী আর কারা কেবল বাহ্যিক আমলের অনুসারী সে পরিচয় আমাদের সবার নিকটই পরিষ্কার।

এগুলো পূর্বযুগের মুনাফিক, বর্তমান যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনারূপে যে আবিষ্কৃত হয়েছে সে হচ্ছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (লাআনতী)। ১৯ই শতকের মাঝামাঝি আবিষ্কৃত এই ভ্রান্ত মতবাদ যা ব্রিটিশ সরকারের মদদে আরো বেগবান হয়। এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সে নিজেও নামায পড়ত, মুখে দাড়িও ছিল, কপালে সিজদার দাগও ছিল। কিন্তু এই হতভাগার অন্তর ছিল নিফাকে পূর্ণ। প্রাথমিক জীবনে একজন ইসলাম প্রচারক হিসেবে আবির্ভূত হলেও শেষমেষ নিজেকেও নবী বলে দাবী করে। শুধু তাই নয় তার কাছে আল্লাহ তায়ালা ওহী প্রেরণ করেন এটাও সে বলত (নাউযুবিল্লাহ)। এই হতভাগ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন পরিশেষে আবু লাহাবের মতো ঘৃণিত মৃত্যু লাভ করে ও জাহান্নমী হয়। তবে আফসোস তার রচিত ভ্রান্ত কাদিয়ানী মতবাদ আজও দুনিয়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষপাষ্প ছড়াচ্ছে।

প্রয়োজন প্রিয়নবীর প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর সুন্নতের পাবন্দ উভয়ই

তাই আমাদের সামনে এখন এই বিষয়টি পরিষ্কার যে আখেরী নবীর উম্মতী হিসেবে সফলকাম হতে হলে আমাদের দুটি কাজ করতে হবে।

১. প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে সর্বাধিক মুহাব্বত করা।

২. তাঁর সুন্নতের অনুসারী হওয়া।

---

[৫] খারেজী অর্থাৎ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া। এরা অত্যন্ত উগ্রপন্থী ও নিষ্ঠুর ছিল। এরা হযরত আলী (রা.) সহ অনেক সাহাবীকে কাফির বলত। এদের নিকট যে কোন ভুল ছিল ক্ষমার অযোগ্য ও নিজ ছাড়া অন্য মুসলমানদের হত্যা করা বৈধ ভাবত। এদের মধ্যে থেকেই একজন খারেজী আবদুল্লাহ বিন মুলজিম হযরত আলী (রা.) কে হত্যা করে।

আমাদের এই দুটোই করতে হবে। কোনটিই বাদ দেয়া যাবে না। এবং এইজন্য আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাচ্ছেল নবী রাসূলের পর সর্বশ্রেষ্ঠ যারা সেই সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যাদের মাকাম ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট যে কোনো অলীর চেয়ে বহুগুণ বেশী। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ এরশাদ করেন পবিত্র কুরআনে–

مُّحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ○ (سورة الفتح ٢٩)

অর্থ ঃ মুহম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরুস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। –(সূরা আল্ ফাত্‌হ্ : ২৯)

সাহাবায়ে কেরাম এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন যাঁদের জীবনের মোহ ঘুরে গিয়েছিল প্রিয়নবীর সান্নিধ্যে এসে। আবু বকর হয়ে গেলেন সিদ্দীকে আকবর, উমর হয়ে গেলেন ফারুকে আযম, উসমান হয়ে গেলেন গনী, জিনুরাইন, আলী হয়ে গেলেন আসাদুল্লাহ ও ইলমের দরজা। এসবই ছিল কারণ তাঁরা ছিলেন প্রিয়নবীর একনিষ্ঠ আশেক ও তাঁর সুন্নতের অনুসারী। তাই তো বলা হয়–

در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
جو نہ تھے خد راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نذر تھی جس نے مُردوں کو مسیحا کر دیا

আপনার দৃষ্টির বরকত বিন্দুকে সাগরে পরিণত করল,
অন্তরকে আলোকিত করল, চোখকে নূরানী করল,
যারা নিজেরাই ছিলেন পথহারা, তারাই হলেন পথপ্রদর্শক,
কি নজর ছিল যা বিভ্রান্তদের পথপ্রদর্শক করে দিল।

সর্বশেষ কথা

মুসলমানদের ঐকবদ্ধ থাকা

মুসলমানেরা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি যদি তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। কারণ ঐক্যবদ্ধ মুসলমানদের পরাস্ত করার শক্তি বিশ্বের কোনো জাতির মধ্যে নেই। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা যায় তবে এরচেয়ে ভয়াবহ মুসলমানদের জন্য আর কিছুই নেই। মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া, বিভেদ হলে ক্ষতি হবে কেবল মুসলমানদের আর লাভবান হবে বিধর্মীরা। তাই তো মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عُدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

(سورة آل عمران ١٠٣)

অর্থ ঃ আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। –(সূরা আলে ইমরানঃ ১০৩)

মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকতেই পারে। মতের অমিল হতেই পারে, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এটা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বৈষম্যে জড়িয়ে যাবে। পিতা-পুত্রের মধ্যে, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে মতের অমিল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নিজেদের মধ্যে সেই অমিলকে কেন্দ্র করে

বৈষম্যে জড়িয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও অনেক সময় মতের অমিল হতো, কিন্তু এই নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কখনো রেশারেশি বা কলহে লিপ্ত হন নি। বরং ইসলামের প্রয়োজনে ছিলেন সদা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ এক শক্তিশালী জামাত, দল, যারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামকে সমুন্নত রেখেছিলেন।

তবে বর্তমান মুলমানদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সামান্য কথাবার্তায় অমিল হলেই আমরা হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ছি। নামাযের পর দুআ হবে কি হবে না, সম্মিলিত দুআ, না একক দুআ, দরূদ সালাম দাঁড়িয়ে না বসে পড়ব এটা সব ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আমরা ভয়াবহ কলহে লিপ্ত রয়েছি। এর ফলে নষ্ট হচ্ছে আমাদের একতা, সৌহার্দ্য ও মূল্যবান সময়। অন্যদিকে সুদী অর্থ ব্যবস্থা, ঘুষ, দুর্নীতির ছড়াছড়ি, মাদক দ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, ইসলামবিরোধী নানা মিথ্যা প্রচারণা এই সমস্ত অতীব দরকারী বিষয় নিয়ে আমরা কখনো আলোচনায় বসি না, এক হওয়া তো আরো দূরের কথা।

শুধু তাই নয়, বর্তমান অবাধ তথা প্রবাহের যুগে মুসলমানেরা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে নানাপ্রকার বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে। টিভি, Internet এর অবাধ প্রবাহে মুসলমান যুব সমাজ আকৃষ্ট হচ্ছে বিধর্মীদের অনুকরণে। 31st December বা নববর্ষ উদযাপন বিভিন্ন উৎসবে উৎসবে নাচ গান ভ্যালেনটাইন ডে, এর মতো প্রভৃত অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়ে বাড়ছে বিভিন্ন অনৈতিক গৃহীত কার্যকলাপ। এগুলো সবগুলোই মানুষকে হারাম ও কুফরের দিকে ধাবিত হয়ে যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে দোযখ। বর্তমানে মুসলমানরা এই সমস্ত অতীব দরকারী বিষয়ের কুফল আলোচনা না করে সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়াচ্ছি।

মুসলমানদের এই দুর্দশা দেখেই মহাকবি আল্লামা ইকবাল তাঁর জাওয়াবে শিকওয়াতে উল্লেখ করেছেন−

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک

ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی، اللہ بھی قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

লাভ লোকসান এক তোমাদের, এক মনজিল এক মোকাম
এক তোমাদের নবী ও রাসূল, এক তোমাদের দ্বীন ইসলাম
এক তোমাদের কাবা, এক তোমাদের আল্লাহ, এক তোমাদের কুরআন
আফসোস, হায় তারপরও তোমরা এক নহ সব মুসলমান।

আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ২৯ সফর ১৪৩৩ হিজরী, ২৪ জানুয়ারি ২০১২, ১১ মাঘ ১৪১৮, দুপুর ১.৩৭ মিনিট রোজ মঙ্গলবার এই **"ঈদে মিলাদুন্নবী মিলাদ মাহফিল, কুরআন ও হাদীস সমর্থিত এক নূরানী মাহফিল"** কিতাবের কাজ শেষ হল।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। সেই প্রিয়নবীর মুহাব্বত এই কিতাব রচনা করা হয়েছে তাঁর রওজাতে বারবার যাওয়ার তৌফিক দান করুন। মহান আল্লাহ তায়ালা যাতে আমাদের সবাইকে তাঁর অনুগত বান্দা ও তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রিয় হওয়ার তৌফিক দান করুক। আমাদের দুনিয়াবী জীবনকে যাতে সহজ করে দিন, পরকালীন আযাব থেকে রক্ষা করে দিন এবং আপনার জান্নাতে দাখিল হওয়ার সুযোগ করে দিন।

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ — اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ
وَنَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ — اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا
وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا ، وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ — وَتُبْ عَلَيْنَا يَا وَمَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ — وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ —
اٰمِيْنَ — بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ —

سید محمد نعیم الاحسان برکتی

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী
২৪.০১.১২

আলোময় জীবন

ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত

তিন ভাইয়ের জীবনী

যাদের জীবন ছিল পবিত্র কুরআনের এই ঐশী বাণীর সোনালী সূত্রে গ্রথিত

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও

তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর

মুফতী-এ-আযম

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ গোফরান বারকাতী (রহ.)

মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)

উপমহাদেশের যে কয়েকজন আলেমে দ্বীন তাদের সূতীক্ষ্ণ মেধায়, নিরলস অধ্যাবসায় ও সুউচ্চ যোগ্যতার মাধ্যমে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরব জগতকেও মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন বায়তুল মুকারমের জাতীয় মসজিদের সর্বপ্রথম খতীব (১৯৬৪-১৯৭৪) মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.)। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফতী। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু উচ্চ মানসম্পন্ন গ্রন্থাবলীর রচয়িতা ও সংকলক।

মুফতী সাহেব (রহ.) ১৯১১ সালের ২৪ জানুয়ারী (১৩২৯ হিজরী ২২ মুহাররম) রোজ সোমবার বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত পাঁচনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাকিম আবদুল মান্নান (রহ.) এবং মা সৈয়দা সাজেদা। তিনি চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। পিতা ও মাতা উভয় সূত্রেই তিনি (নাজিবুত্তারাফাইন)। মুফতী সাহেবের জন্মের কয়েক মাস পূর্বে তাঁর দাদী একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, তাঁর নামের সাথে আমিমুল ইহসান রাখার সুসংবাদ দেয়া হল। তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তরেই এই সুসংবাদ প্রাপ্ত নাম সার্থক প্রমাণিত হয়েছিল।

মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) তাঁর পিতা ও চাচার নিকট থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে তাঁর চাচা সাইয়্যেদ আব্দুদ দাইয়্যানের (রহ.) নিকট হতে পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআন খতম করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। মুফতী সাহেবের শিক্ষার প্রতি এমন অদম্য স্পৃহা দেখে তাঁর পিতা তাকে সাইয়্যেদ বারাকাত আলী শাহ (রহ.)-এর দরবারে নিয়ে যান। শাহ সাহেব নিজ ভক্ত মুরীদদের সাথে আসা শিশু আমীমুল এহসানকে দেখে মুগ্ধ হন। মাত্র দু বছরের ব্যবধানে মুফতী সাহেব হযরত বারকাত আলী শাহ (রহ.)-এর নিকট থেকে আরবী ব্যাকরণের (মীজান মুন্‌শায়ের) প্রাথমিক জ্ঞান রপ্ত করেন এবং পাশাপাশি উচ্চতর ফার্সী সাহিত্য ও তাজবীদের প্রাথমিক জ্ঞান গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মুফতী সাহেব (রহ.) হযরত শাহ বারকাত আলী শাহ (রহ.)-এর মুরীদ হন। তাই মুফতী সাহেব নিজের নামের শেষে 'বারকাতী' কথাটি যুক্ত করেন।

১৯২৭ সালে মুফতীসাহেব পিতৃহীন হয়ে পড়েন। পিতার জীবিত সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। উল্লেখ্য মুফতী সাহেবের বড় ভাই সাইয়্যেদ আযীমুশ্‌শান কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

ইন্তেকাল করেন। তখন মুফতী সাহবে মাত্র আট বছর বয়সের ছিলেন। ১৩৪৬ হিজরীর ৯ই রমযান মুফতী সাহেবের পিতা হযরত সাইয়্যেদ আবদুল মান্নানের ইন্তেকালের পর ছোট ভাই বোনের লালন-পালন ও শিক্ষার দায়িত্ব, পিতার চিকিৎসালয় ও পারিবারিক প্রেস পরিচালনা, গৃহ সংলগ্ন (জালুয়াটুলীস্থ) মসজিদের ইমামের দায়িত্ব প্রভৃতি তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। আল্লাহর অসীম দয়ায় তিনি নবীন হলেও এসব দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ও কৃতিত্বের সাথে পালন করেন।

১৯২৬ সালে পনের বছর বয়সে মুফতী সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং "মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন" উপাধি প্রাপ্ত হন তিনি আলিম পরীক্ষায়ও হাদীস বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা মুফতী মুশতাক আহমেদ কানপুরী (রহ.) সাহেব এর নিকট থেকে 'মুফতী' সনদ লাভ করেন। তখন থেকে তিনি 'মুফতী' খেতাবে আখ্যায়িত হন।

১৯৩৪ সালে মুফতী সাহেবকে কলকাতার বৃহত্তর জামে মসজিদ "নাখোদা মসজিদ" এর সহকারী ইমাম ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৩৫ সালে তাকে 'নাখোদা মসজিদ' এর মাদ্রাসার দারুল ইফতার প্রধান মুফতীর দায়িত্ব দেয়া হয়। এ সময় তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাকল্পে প্রায় লক্ষাধিক ফাতওয়া প্রদান করেন। এ সময় তার সুনাম ও যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নাখোদা মসজিদের ও দারুল ইফতার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৪৩ সালে মুফতী সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সাল থেকে ভারত বিভাগ (১৯৪৭) পর্যন্ত তিনি টাইটেল কামিল ক্লাসে হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ এবং ফাযিল শ্রেণীতে উর্দু-ফার্সী শিক্ষা দিতেন। ১৯৪৭ সালে আলিয়া মাদ্রাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে তিনি এই দেশে হিজরত করে আসেন। তখন তিনি নতুনভাবে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনার কাজে জড়িত হন। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন সরকার তাকে ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৫৫ সালে আলিয়া মাদ্রাসার হেড মাওলানা, মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী অবসর গ্রহণের পর মুফতী সাহেব অস্থায়ীভাবে সেই পদে নিয়োগ পান। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মুফতী সাহেব স্থায়ীভাবে সেই পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে জ্ঞান বিজ্ঞানেরা

গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ধর্মীয় কাজে প্রচুর সময় দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ১৯৬৯ সালের ১ই অক্টোবর উক্ত পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন।

মুফতী সাহেবের একটি অনন্য অর্জন রয়েছে যে তিনি দুই বাংলার ঈদগাহতে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতা থাকার সময় কলকাতা ঈদগাহে ইমামতি করেন এবং ১৯৫৫ সালে আলিয়া মাদ্রাসায় হেড মাওলানার পদে উন্নীত হবার পর তৎকালীন ঢাকার প্রধান ঈদগাহ পুরানা পল্টন ময়দানে ঈদের জামাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৪ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন কমিটির চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া বাওয়ানীর অনুরোধে এবং মসজিদ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে তিনি সেই মসজিদের খতীব এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এই মহান দায়িত্ব কৃতিত্ব সহকারে পালন করেন। হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) প্রতি শুক্রবার সেখানে জুমার নামাজ পড়াতেন এবং আরবীতে স্বরচিত খুৎবা পড়তেন। খুৎবার বঙ্গানুবাদ পূর্বেই শ্রোতাদেরকে শোনানো হত। অভিনব পদ্ধতিতে অনর্গল বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তাঁর খুৎবা প্রদানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল ব্যাপার। আরবদেশ থেকে আগত অনেক উচ্চশিক্ষিত আলেম ও রাষ্ট্রনায়ক তাঁর খুৎবা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন।

মুফতী সাহেব (রহ.) তাঁর যে কিতাব ও রচনার জন্য সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কাছে পরিচিত ও গৃহীত হা হচ্ছে তাঁর কিতাবের মাধ্যমে। আরবী ও উর্দু ভাষায় তিনি অসংখ্য বই লিখেছেন তবে তাঁর মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কম। তাঁর যে বই সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রশংসনীয় এবং মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত তা হচ্ছে "ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার"। এই বইটি চারশতের অধিক হাদীস ও শরাহ গ্রন্থের সার নির্যাস যা হানাফী মাযহাব ও মতাদর্শের আলোকে রচিত হয়েছে। তাঁর বইয়ের প্রশংসায় মাওলানা সাইয়্যেদ হোসাইন আহমেদ মাদানী (রহ.) বলেছেন– "আমি আজ পর্যন্ত ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার এর মতো কিতাব দেখিনি। হানাফী মাযহাবের এটি একটি অতুলনীয় যুক্তিপূর্ণ দলিলভিত্তিক কিতাব।" মুফতী সাহেবের আরেকটি বিখ্যাত বই হচ্ছে, 'কাওয়ায়িদুল ফিকহ' যাতে ফিকহ শাস্ত্রের মৌলিক উসূল ও পরিভাষাসমূহ আলোচিত হয়েছে। তাঁর একটি অন্যতম রচনা হচ্ছে নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার তৈরি। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে তাঁর রচিত নামাযের সময়সূচি অনুযায়ী নামাযের সময় ও ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হয়।

মুফতী সাহেব (রহ.) ঢাকায় আসার পর তাঁর ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতির মাধমে একটি পরিত্যক্ত মসজিদের কথা জানতে পারেন। পরে তিনি কলুটোলায় অবস্থিত সেই মসজিদটির পুনঃসংস্কার করেন এবং

সেখানে নিয়মিতভাবে নামায পড়ার বন্দোবস্ত করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি সেই মসজিদ সংলগ্ন একটি বাড়ি ক্রয় করেন নিজের থাকার জন্য। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেই বাড়িতে বসবাস করেন। উল্লেখ্য মুফতী সাহেব (রহ.) নিজের জীবনে মোট তিনবার হজ্জ পালন করেন।

সাইয়্যেদ বংশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান (রহ.) ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর (১৩৯৫ হিজরীর ১০ই শাওয়াল) এ দুনিয়াবাসীকে বিদায় জানিয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে জান্নাতবাসী হন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তেকাল কোন সাধারণ মানুষের ইন্তেকাল নয়, বরং একজন "বাহরুল উলূম" এর ইন্তেকাল ছিল। তাই তো বলা হয়–

موت العالِم موت العالَمُ

আলিমের মৃত্যু জনপদের মৃত্যুসদৃশ

এ জ্ঞান তাপসের মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। তাঁর জানাযায় লাখো মানুষের ঢল নামে। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন তাঁরই ভাগ্নে ও নারিন্দার মরহুম পীর সাহেব হযরত সাইয়্যেদ নযরে ইমাম (রহ.)। ইন্তেকালের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলুটোলা মসজিদের দক্ষিণ পাশের কামরায় তাঁকে কবরস্থ করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদটি এখন তাঁরই নামে **"মসজিদে মুফতী-এ আযম"** নামে পরিচিত। তাঁর মাযার ফলকের উপর খোদাই করা করে লেখা রয়েছে এই ফার্সী কবিতা যা তাঁর মতো আল্লাহওয়ালা বান্দাদের জন্য অত্যন্ত সত্য।

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

যাদের মনপ্রাণ পরম মাওলার প্রেমে বিভোর থাকে তাদেরকে কোন অবস্থায় মৃত বলে ধারণা করবে না।

তারা কিয়ামত পর্যন্ত আছেন, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

ইসলামের সেবায় ও দাওয়াতি কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে (১৪০৫ হিজরী) মুফতী সাহেবকে মরণোত্তর স্বর্ণপদক ও সনদ দান করেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই বিশ্বনন্দিত আলেম এর জীবন ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান করুন। (আমীন)

হযরত সাইয়েদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহ.)

হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) ১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ (১৩৩৬ হিজরীর ১৭ই রমজান) ভারতের বিহার প্রদেশের রাঁকাঢ় নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ মুহাম্মদ হাকিম আবদুল মান্নান (রহ.) ও মা সৈয়দা সাজেদা। তিনি চার ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়া (ইংলিশ সেকশন) থেকে পাঁচটি বিষয়ে স্টার মার্ক পেয়ে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেক থেকে ব্যাচেলার অব সার্জারি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও উংরেজী ভাষায় সমভাবে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর বড় ভাই হযরত আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) সাহেবের সাথে কলকাতা থেকে ঢাকায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর সুযোগ্য ও একান্ত সহচর ও খলিফা ছিলেন। উল্লেখ্য মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) ছিলেন বায়তুল মুকাররমের (১৯৬৪-১৯৭৪) সর্বপ্রথম খতীব।

হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) সাহেব তাঁর বড় ভাই এর সাথে কলুটোলাস্থ **মসজিদে মুফতী-এ আযম** পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি উক্ত মসজিদে প্রতিদিন এশার নামজের পর খাতমে খাজেগান পরিচালনা করতেন যা মহান আল্লাহর রহমতে এখনো জারি আছে।

বর্তমান দুনিয়ায় হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) সাহেবের মত আঁশেকে রাসূল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তিনি আজীবন প্রতি সোমবার বাদ আসর নিজ গৃহে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতেন। মূলত তাঁর সারা জীবনটাই নবী করিম ﷺ এর প্রতি প্রেমের অসংখ্য নজীরে ভরপুর। তিনি তাঁর সন্তান-সন্তানাদি ও পরিবারের সদস্যদেরকেও নামাযী ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। নারিন্দা শরীফের পীর সাহেব হযরত শাহ আবদুস সালাম (রহ.) তাঁর আপন ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার, খোদাভীরু, নম্রতা ও ভদ্রতার প্রতিমূর্তি।

আশেকে রাসূল হিসেবে বক্তৃতা ও ওয়াজে প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.)-এর অপরিসীম ভালোবাসা সর্বদাই

প্রতিফলিত হত। সহীত বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে নিজের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানব জাতি হতে অধিক না ভালবাসে।" এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) মন্তব্য করেছেন যে, "শুধু ঈমানের পূর্ণতা নয়, বরং সে ব্যক্তিকে মুমিন বলাও বৈধ নয় যার মাঝে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা না থাকে।

সূরা 'আদ-দোহা' যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন– "হে রাসূল আপনার প্রতিপালক আপনাকে অদূর ভবিষ্যতে এমন নেয়ামত দান করবেন যার দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।" এই আয়াতের তাফসির করার সময় জনাব হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) সাহেব আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলতেন– "গোটা পৃথিবীর মুসলমাগণ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত আর আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে সন্তুষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। সুবহানাল্লাহ।

জনাব হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) সর্বদা পরম মাওলার যিকির আযকারে মশগুল থাকতেন। এমনকি তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল বন্দেগীও তিনি নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। তিনি জীবনে তিনবার হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি জামাতে জানায পড়াকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও ঝড়-বৃষ্টি তুফানের বালাই না করে নিয়মিত জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতেন। হযরত নোমান সাহেব সর্বদাই নবীর সুন্নাহকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করতেন। তার প্রিয় তরকারীও ছিল কদু (লাউ) যা আমাদের প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকটও অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) সাহেবের একটি খুব বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি সর্বদাই অযু অবস্থায় থাকতেন। প্রচণ্ড শীতের সময় যখন অযু করা কষ্টকর ব্যাপার ছিল তখনও তিনি তায়াম্মুম করে পবিত্র থাকতেন। এমনকি ঘুমানোর পূর্বেও তিনি তায়াম্মুম করে ঘুমাতেন।

হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) যদিও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি তাঁর বড় ভাই হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) এর মতো সুদক্ষ আলেমের সাহচর্যে হয়ে উঠলেন এক পরিপূর্ণ আলেমে দ্বীন। তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) যখন বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতীবের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তখন তাঁর মেঝ ভাই হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.)-কে মসজিদে 'মুফতী-এ-আযম' জুমার ও ঈদের নামাজের খতীবের দায়িত্ব প্রদান করেন।

হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) তাঁর বড় ভাই হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) অত্যন্ত সম্মান ও মুহাব্বাত করতেন। তিনি মুফতী সাহেব হুযুরের যত সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন আর কেউ সে রকম সুযোগ পায় নি। শৈশবকাল থেকে কলকাতা জীবন, সেখান থেকে ঢাকায় আগমন থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি মুফতী সাহেবের নিকটে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তো হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) মুফতী সাহেবের ওফাতের পর যখনই মসজিদে যেতেন মুফতী সাহেবের মাজার যেয়ারত করতেন। হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) সাহেব যতবার তাঁর ভাই হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর মাজার যেয়ারত করেছেন তেমনটি আর কেউ করতে পারে নি।

১৯৭৮ সালে হযরত নোমান সাহেব কতৃপক্ষের দাওয়াতে তৎকালীন ঢাকার প্রধান ঈদগাহতে অর্থাৎ পুরানা পল্টন ঈদগাহ এর ঈদের নামাজের ইমামতি করেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ও মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রদূতসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) ইমামতিতে ঈদের নামায আদায় করেন।

উল্লেখ্য একই ইদগাহতে হযরত নোমান সাহেবের বড় ভাই, হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) ১৯৫৫ সাল থেকে বায়তুল মুকাররমের খতীবের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত ঈদের নামাজের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। এটি একটি বিরল ব্যাপার যে, ঢাকার প্রধান ঈদগাহতে একই পরিবারের দুই সদস্য এবং আপন দুই ভাই হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) ও হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.) ঈদের নামাজের ইমামতি করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মূলত হযরত সাইয়েদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহ.)-এর সম্পূর্ণ জীবন ছিল ইসলামের আলোকে আলোকিত। তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সুন্নাহকে অনুসরণ করতেই তাঁর পূর্ণ জীবন ব্যয় করেন। হাসনি ও হোসাইনি সাইয়্যেদ বংশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র অগণিত ভক্ত অনুরক্তগণকে আল্লাহর প্রেমের সুধা পান করিয়ে ২০০৫ সালের ২ জুন (১৪২৬ হিজরী ২৩ রবিউস সানী) আবে জমজম পান করা অবস্থায়, কালেমা উচ্চারণ করতে করতে পরম মাওলার দাওয়াতকে লাব্বাইক বলে চির শান্তির ধাম জান্নাতের পথে গমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। দীর্ঘদিন যে মসজিদের খতীবের খেদমতে হযরত নোমান সাহেব নিযুক্ত ছিলেন সেই মুফতী-এ-আযম মসজিদেই শুক্রবার বাদ জুমা তাঁর জানাযা নামাজ

অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জানাযা নামায ছিল মসজিদের ইতিহাসের সর্ববৃহৎ জানাযা নামায। কারও জানায নামায পড়তে এত অধিক সংখ্যক মুসল্লীর আগমন এই **মসজিদে মুফতী-এ আযম**-এ কখনোই হয়নি। সাধারণত জুমার নামায শেষে মুসল্লীরা মসজিদ থেকে চলে যায়। সেদিন জুমা নামায বাদ অন্যান্য মসজিদ থেকেও লোকেরা জড়ো হয় এই আল্লাহওয়ালা বান্দার জানাযা নামাযে শরীক হওয়ার জন্য। তাঁর জানাযা নামাজে ইমামতি করেন তাঁরই ভাগ্নে মাওলানা মুহাম্মদ সালেম ওয়াহেদী। পরে আজিমপুর বড় দায়রা শরীফের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁরই ছোট ভাই হযরত গোফরান বারকাতীর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী (রহ.)

হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী (র.) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন (১৩৩৭ হিজরীর ৯ই রমজান) ভারতের বিহার প্রদেশের রাকাঁঢ় নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাকিম আবদুল মান্নান ও মাতা সাইয়্যেদা সাজেদা। তিনি চার ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

নয় বছর বয়সে তাঁর বড় ভাই মুফতী আমিমুল ইহসান সাহেব নিজের ছোট ভাই গোফরান বারকাতীকে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করান। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী (রঃ) তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরেই নিজের অসামান্য মেধার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি ছাত্র বৃত্তি অর্জন করেন। সে সময়ে পুর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এই তিন প্রদেশ মিলিয়ে কামিল, ফাদ্বিল ও আলিম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত। গোফরান বারকাতী সাহেব এই তিনটি পরীক্ষাতেই সেই তিন প্রদেশের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করেন।

শিক্ষাজীবনে নিজ অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ১৯৩৫ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন দুই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, গোফরান বারকাতীকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়াতে শিক্ষা শেষ করার পর পরই তিনি সেখানে শিক্ষকতার সুযোগ পান এবং শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী নিজ কর্মজীবনের শুরুতেই কলকাতায় কাজী হিসেবে নিয়োগ পান। সেখানে তিনি কাজী এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। পরবর্তীতে ভারত বিভাগ এর পর ঢাকায় আসলে

তিনি লালবাগ থানা এলাকার মুসলিম ম্যারেজ রেজিষ্টার ও কাজী হন। তিনি রাজনীতিক ভাবেও বেশ সক্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা মিউনিসিপাল করপোরেশন (বর্তমান ঢাকা সিটি করপোরেশনের) কমিশনার নিযুক্ত হন।

হযরত গোফরান বারকাতী তাঁর বড় ভাই মুফতী-এ-আযম হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (র)-এর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। মুফতী সাহেবকে বেশ কয়েকটি বই লিখতে হযরত গোফরান বারকাতী সাহেব সহযোগীতা করেন। 'মিয়ারুল আসার' নামক আরবীতে রচিত উসূলে হাদীসের একটি বই যা হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী সাহেব উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়াও 'ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার ' (فقه السنن والا شار) কিতাবে তিনি প্রকাশকের ভূমিকা পালন করেন। মুফতী আমিমুল ইহসান বারকাতী নিজ জীবদ্দশায় পনের জনকে নিজের খলিফা হিসেবে মনোনয়ন করেন। এদের মধ্যে যাকে তিনি সর্বপ্রথম নিজ খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেন তিনি ছিলেন হযরত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী (রঃ)।

১৯৬৪ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমান পাকিস্তানে) কাবা শরীফের গেলাফ প্রস্তুত করা হয়। তখন সেই গেলাফটি ঢাকায় আনা হয় প্রদর্শনীর জন্য। ঢাকায় কাবা শরীফের গেলাফ প্রদর্শনীর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সাইয়্যেদ মুহাম্মদ গোফরান বারকাতী। তিনি তাঁর বড় ভাই মুফতী আমিমূল ইহসান এর মাধ্যমে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, মুফতী -এ-আযম জামে মসজিদসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে কাবা শরীফের গেলাফ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত মিশুক স্বভাবের মানুষ সাইয়্যেদ গোফরান বারকাতী ছিলেন। তিনি ছোট বাচ্চাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি একজন খোদাভীরু ও পরহেজগার বান্দা ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুসরণ ও মুহাব্বত করতেন। তিনি জীবনে মোট চারবার হজ্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি জামাতে নামায পড়াকে গুরুত্ব দিতেন এবং সর্বদাই মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়তে সচেষ্ট ছিলেন। অসংখ্য কুরআনের আয়াত ও হাদীস তাঁর কণ্ঠস্ত ছিল। এমনকি বোখারী শরীফ প্রায় পুরোটাই তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর মর্মস্পর্শী ওয়াজ শুনে মানুষ আবেগ আপ্লুত হয়ে যেত। উল্লেখ্য তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ বেতার) এ নিয়মিত ইসলামী আলোচনা করতেন এবং পবিত্র কোরআনের তাফসীর করতেন।

১৯৮৯ সালে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম প্রাঙ্গণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর মিলনায়তনে মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) এর জীবন ও কর্ম উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বায়তুল মুকারমের তৎকালীন খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.), মাওলানা সালেম ওয়াহেদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আরও অনেক উলামায়ে কেরাম। সেই জনাকীর্ণ মাহফিলে মুফতী আমিমুল ইহসানের ভাই ও খলিফা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাইয়্যেদ গোফরান বারকাতী। বিস্ময়ের ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি নিজ আধঘণ্টার সম্পূর্ণ বক্তব্য উর্দু ভাষায় দেন এবং উপস্থিত প্রায় সবাই ছিল বাংলাভাষী। কিন্তু তাঁর আন্দাজে বয়ান এবং বাচনভঙ্গি ছিল এতটাই চমৎকার যে, সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ওয়াজ শুনছিলেন। মাহফিল শেষে দোআ পরিচালনা করেন সাইয়্যেদ নোমান বারকাতী (রহ.)।

হযরত গোফরান বারকাতী মিলাদ মাহফিলকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিলাদ মাহফিল করতেন। আলহামদুল্লিাহ তাঁর ইন্তেকালের পর এখনও প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁর বাসভবনে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯১ সালে ৩০শে জুন (১৪১১ হিজরী ১৬ই জিলহজ্ব) সাইয়্যেদ বংশের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র এ দুনিয়াবাসীকে বিদায় জানিয়ে মহান আল্লাহর দাওয়াতকে কবুল করেন এবং চিরশান্তির ধাম জান্নাতের পথে গমন করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর প্রথম জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় মোহাম্মদপুর ঈদগাহ মাঠে যেখানে ইমামতি করেন তাঁর মেজ ভাই সাইয়্যেদ মুহাম্মদ নোমান বারকাতী (রহঃ)। এছাড়া চকবাজার শাহী মসজিদে তাঁর আরেকটি জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে আজিমপুর বড় দায়রা শরীফের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

الهی عبدك العاصی اتاك   مقرا بالذنوب فقد دعاك

فان ترحم فانت لذك اهل   وان تغضب فمن يرحم سواك

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) আল-কুরআন

২) আল-হাদীস (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, সুনানে ইবনে দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে ইবনে নাসাই, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, বায়হাকী শরীফ, মিশকাত শরীফ, তাবরানী শরীফ, আবু নাঈম শরীফ ও হিসনে হাসীন)।

سراجا منیرا اور میلادنامہ

مفتی سید محمد عمیم الاحسان برکتی

৩) সিরাজুম মুনীরা ঃ মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমিমুল এহসান বারকাতী (র)

میلادالنبی

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

৪) মিলাদুন্নবী ঃ শায়খুল ইসলাম ডক্টর মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী।

৫) মাদারিজুন নবুয়্যত ঃ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী।

৬) দরূদ শরীফের ফযীলত ও মাহাত্ম্য ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম।

৭) দালায়েলুল খায়রাত ঃ আল্লামা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সোলায়মান যাজুলী।

৮) মহানবী এর মর্যাদা ঃ ড. আল্লামা সাইয়্যেদ ইউসুফ আল-রেফাঈ।

৯) সাকীয়ে কাওসার ঃ হযরত সায়্যিদ শাহ মুহাম্মদ ফারুক

১০) বিশ্বনবীর জন্ম ইতিহাস ও মিলাদ শরীফের হুকুম ঃ মাওলানা হাফেজ আবদুল হক এলাহবাদী মুহাজিরে মক্কী (রহঃ)

Also the lectures of Shaikhul Islam Dr. Muhammad Tahirul Qadri. To get the free Internet edition and also the English edition of this book, Please email us at

barkatipublications@gmail.com

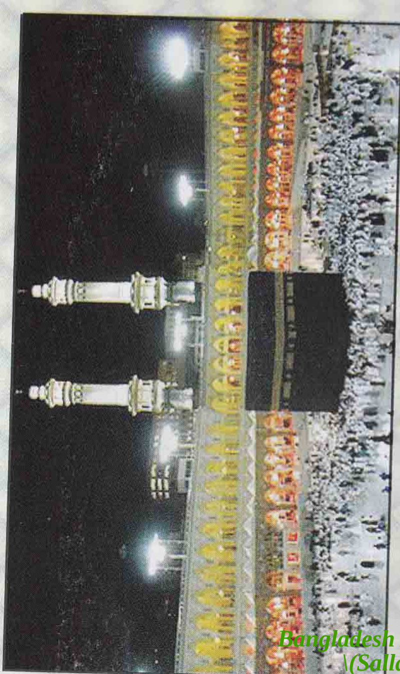
পবিত্র মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ



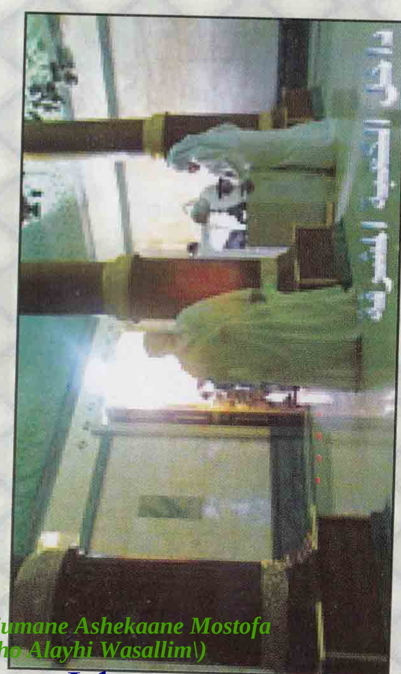
প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক



পবিত্র সাফা ও মারওয়ার সায়ী এর স্থান

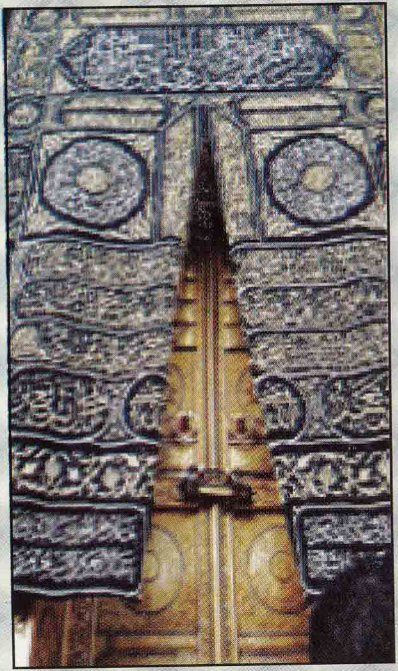


পবিত্র কাবা শরীফ



পবিত্র কাবা শরীফের ভিতরের ছবি

পবিত্র মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ


পবিত্র কাবা শরীফের দরজা


পবিত্র আবে জমজম এর কূপ

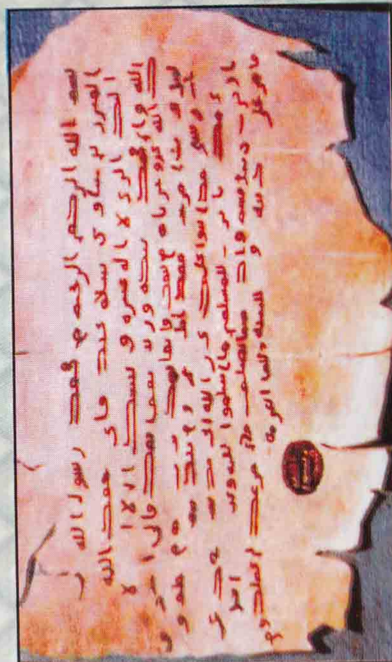

পবিত্র মাকামে ইব্রাহীম


পবিত্র হাজরে আসওয়াদ

পবিত্র মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ



প্রিয় নবীর জন্ম স্থান (বর্তমানে গ্রন্থাগার)



প্রিয় নবীর নিজ হাতে লেখা চিঠি (তুরস্কে অবস্থিত)



পবিত্র হেরা গুহা ঃ ওহী সূচনা স্থান



প্রিয় নবীর জন্ম স্থান (বর্তমান গ্রন্থাগারের ভিতরের ছবি)

পবিত্র মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক স্থান সমূহ



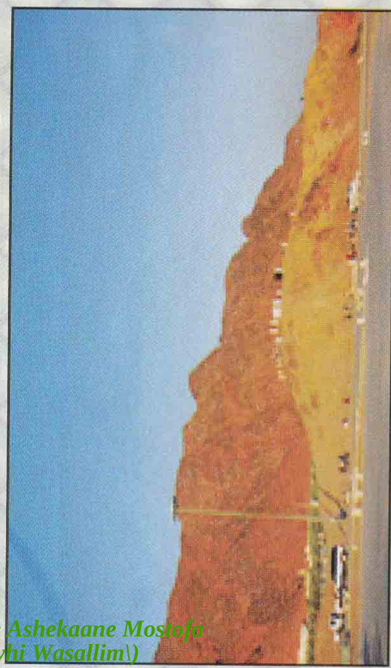
ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের স্থান



মসজিদে নববীর নিকটবর্তী জান্নাতুল বাকী (সাহাবায়ে কেরামদের কবর স্থান)



প্রিয় নবীর ব্যবহৃত লাঠি, পাগড়ী ও চাদর মোবারক



পবিত্র ওহুদ পাহাড়